বিমান দুর্ঘটনা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার এবং এ্যারোপ্লেনের নিরাপত্তা

আলমগীর সাত্তার

আকাশ পথে যাতায়াতে বিপ্লব ঘটে গেছে অনেক আগেই। এ্যারোপ্লেনের উন্নত কারিগরি প্রযুক্তি এবং ক্রমাগত যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে বিশালাকার উড়োজাহাজের প্রসার আকাশ পথের ব্যবহার ও পরিধি দিনকে দিন বিস্তৃত করে চলেছে। উন্নত বিশ্বে উড়োজাহাজের ব্যবহার অনেকটা বাসের মতো গণপরিবহনের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। নব নব প্রযুক্তির ব্যবহারে আকাশভ্রমণে এসেছে বিলাসবহুল স্বাচ্ছন্দ্যও। আরাম-আয়েশও বাড়ছে যাত্রীদের। কিন্তু এত কিছুর পরেও সাফল্যের পাশেই যেন ব্যর্থতার অন্ধকার! বিমান দুর্ঘটনা শুধু বাংলাদেশের মতো অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেই সংঘটিত হচ্ছে না, উন্নত বিশ্বেও ঘটছে বিমান দুর্ঘটনা। নানা কারণেই দুর্ঘটনা ঘটছে। যান্ত্রিক ত্রুটি, পাইলটের ভুলভ্রান্তি আর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের সঙ্গে পাইলটের যোগাযোগ-বিভ্রান্তিসহ নানা কারণ এসব দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। বাংলাদেশে সম্প্রতি আবারও ঘটে গেল এক মারাত্মক বিমান দুর্ঘটনা। চট্টগ্রামের আমানত শাহ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একটি যাত্রীবাহী ডিসি-১০ সম্প্রতি দু' শতাধিক যাত্রী নিয়ে দুর্ঘটনায় পড়েছিল। এ যাবত প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে কন্ট্রোল টাওয়ারের নির্দেশ অনুসরণ না করে ভুল ল্যাডিংয়ের কারণেই এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রী সাধারণ এবং জনগণের অনেকেই এয়ার ট্রাফিক-কন্ট্রোল টাওয়ার এবং উড়োজাহাজের যান্ত্রিক দিকগুলো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই যান্ত্রিক তথা কারিগরি বিষয়টি নিয়েই এবারের প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচনা করেছেন প্রবীণ পাইলট

আকাশযান যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, ইংরেজীতে তাকে বলা হয় 'এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার' (ইকউ)। নিরাপদে এরোপ্লেন চলাচলের জন্য এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের গুরুত্ব দিনদিনই বেড়ে চলেছে বলেই প্রসঙ্গটি নিয়ে একটু বিস্তারিতভাবে লিখতে চাই।

পনেরো থেকে বিশ বছর পর যদি দেখি এ্যারোপ্লেনের ওড়াওড়ির ক্ষেত্রে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা একেবারে পাইলটদের সমান গুরুত্ব পাচ্ছেন, তাহলে অবাক হওয়ার মতো কিছুই হবে না। বর্তমানেও তাদের যে গুরুত্ব, এ ব্যাপারে সবাই সমানভাবে জ্ঞাত নয় বলেই আজকের এই লেখা।

এ্যারোপ্লেন এখন নিত্যযাত্রার বাহন। আজকাল অত্যাধুনিক এ্যারোপ্লেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কেবিনে বসে টেলিভিশনের নানা অনুষ্ঠান এবং সিনেমা ইত্যাদি দেখতে দেখতে যাত্রীরা নিশ্চিন্ত মনে আকাশপথে ভ্রমণ করে থাকেন অথবা নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করেন ঘুম বা বিশ্রাম। এসব কিছুর জন্য বিশালাকারের এ্যারোপ্লেনগুলোর যন্ত্রপাতি খুবই উন্নতমানের এবং নির্ভরশীল করে যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরা অবশ্যই যথেষ্ট কৃতিত্বের অধিকারী। আর যে সব পাইলট এ্যারোপ্লেন পরিচালনা করছেন এবং যেসব আকাশযান নিয়ন্ত্রণকারী ভূমিতে বসে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশ দিয়ে প্লেনগুলো নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁদের কৃতিত্বও কম নয়।

এ্যারোপ্লেন চলাচলের ইতিহাস পর্যালোনা করলে দেখা যাবে, একেবারে শুরুর দিকে এ ব্যাপারে পাইলটরাই ছিলেন সবকিছু। তাঁরা নিজেদের প্লেন ডিজাইন করতেন এবং তৈরি করার পর তা নিয়ে করতেন ওড়াওড়ি। কিন্তু ধীরে ধীরে এ্যারোপ্লেনগুলোর অনেক উন্নতি হলে, ওগুলো তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলীরা। পাইলটদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে গেল কেবল প্লেন ফ্লাইং করার মধ্যে। এমন একটা সময় গেছে, যখন দূর-দূরান্ত পাড়ি দিতে সক্ষম এরোপ্লেনে নেভিগেটর এবং রেডিও অপারেটর বহন করা ছিল একেবারেই অপরিহার্য। কিন্তু রেডিও টেলিফোনের ব্যবস্থা এবং নেভিগেশন যন্ত্রপাতি উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেডিও অপারেটর এবং নেভিগেটরদের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেল। চলে গেল তাদের চাকরিও। গুরুত্ব বাড়তে লাগল এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের। পাইলটরা তাঁদের দেয়া নির্দেশনামা কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলতে লাগলেন। এ ব্যাপারে সামান্য অবাধ্য হওয়া মানেই অনিবার্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। অবাধ্য হওয়া মানেই উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেনগুলোর পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ হওয়া।

ভূমি থেকে নির্দেশ পাঠিয়ে বিমান নিয়ন্ত্রণ করার কাজ শুরু হয় ১৯২০ সালে। আমেরিকার নর্থ ক্যারোলিনা রাজ্যের আর্চি লিগ (Archie League) নামের এক বিমান কর্মকর্তা রঙিন পতাকা ও লাল-নীল বাতি ব্যবহার করে এ্যারোপ্লেনগুলোকে টেকঅফ এবং ল্যান্ড করার নির্দেশনা দিতে শুরু করেন। আর ভল্যানটিয়ার হিসেবে তাঁর সহযোগী হলেন উইলিয়াম হুইটনি নামের অন্য এক ভদ্রলোক। এদের দু'জনকে তাই আকাশযান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জনক বলে গণ্য করা হয়। লাল-নীল বাতির সঙ্কেত দেখিয়ে ল্যান্ড ও টেকঅফ করার অনুমতি দেয়ার যে প্রচলন ওই দুই ভদ্রলোক করেছিলেন, ক্রমেই তা দুনিয়াব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করল। তার পর বহু বছর পর্যন্ত ব্যবস্থাটা বহাল থাকে। ১৯৬৫ সালে আমি যখন ঢাকা ফ্লাইং ক্লাবে শিক্ষানবিস পাইলট হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করি, তখন আমরা অস্টার ইগলেট নামের একটা ট্রেনার ছোট্ট প্লেন ফ্লাইং করতাম। ওই এ্যারোপ্লেনে রেডিও ছিল না। তাই টেকঅফ এবং ল্যান্ড করার আগে কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সবুজ বাতির সঙ্কেত পেলে টেকঅফ বা ল্যান্ড করতাম। লালবাতির সঙ্কেত পেলে অপেক্ষা করতে হতো।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে উড়োজাহাজের সংখ্যা বাড়তে থাকে দ্রুত হারে। উন্নত হতে লাগল বিমানবন্দরগুলোও। অল্প সময়ের মধ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছতে আকাশপথে ভ্রমণ করা একান্ত অপরিহার্য এবং নিরাপদ বলে সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পেল। দ্রুত যোগাযোগের জন্য এয়ার মেইল সার্ভিস গণ্য হলো অত্যাবশ্যকীয় বলে।

বিংশ শতকের দুয়ের দশকে বেসামরিক বিমান চলাচলের স্বার্থে ম্যাপের ওপর চিহ্ন দিয়ে আকাশপথ বা এয়ারওয়েজ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ১৯৩০ সালের দিকে আমেরিকায় বিমানবন্দর এবং আকাশপথে সামান্য দূরত্বে দূরত্বে রেডিও স্টেশন (যেমন VOR এবং NDB) বসিয়ে ম্যাপের ওপর রুটগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হলো। এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল আকাশপথের সংজ্ঞা।

১৯২০ সালের দিকে আবিষ্কৃত হয় রেডিও। তার পরেই শুরু হয় বেতারযন্ত্রে কণ্ঠের সম্প্রচার কার্যক্রম। ১৯৩০ সালে আমেরিকার ক্লিভল্যান্ড বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ গর্বের সঙ্গে এই মর্মে ঘোষণা প্রচার করে যে, তারা বিমানের উড্ডয়নে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কন্ট্রোল টাওয়ারে বসিয়েছে রেডিওস্টেশন। শুরু হয়ে গেল এ্যারোপ্লেনগুলোতেও বেতারযন্ত্র বসানোর কাজ। ফলে প্রায় রাতারাতি আকাশযান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সূচনা হলো এক নবযুগের। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলের (এটিসি) লোকজন উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেনের পাইলটদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পেলেন।

আকাশে নিরাপদে ওড়াওড়ির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় অনুভূত হচ্ছিল প্রথম থেকেই। ১৯১০ সালের দিকে যাঁরা এই কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, প্যারিস শহরে তাঁরা একটা সম্মেলন ডেকে তাতে মিলিত হন। বিমান চলাচল বা তাদের উড্ডয়নে কী ধরনের নিয়মশৃঙ্খলা হওয়া উচিত, এসব নিয়ে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই কনফারেন্সে ফ্লাইংয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় একটা ক্লাব। বাংলায় আমরা যার নাম দিতে পারি "উড্ডয়ন সংঘ"।

১৯১৪ সালে উড্ডয়ন সংঘের এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় পাইলটদের দিক ও পথ নির্দেশ করার জন্য ভূমিতে চিহ্ন তৈরি করা হবে। এ্যারোপ্লেনে ব্যবহারযোগ্য কম্পাস বা দিকদর্শন যন্ত্র তখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি বলেই এমনটা করার প্রয়োজন পড়ে। তখনকার দিনে পাইলটরা বিমান নিয়ে আকাশে ওড়ার পর সামনের কোন নির্দিষ্ট বস্তু দেখে সেদিকমুখো প্লেন পরিচালনা করতেন। তাই দিকনির্দেশনার জন্য ভূমিতে স্থাপিত হলো বিশাল আকারের জ্যামিতিক তীর চিহ্ন, সেটা অনুসরণ করে পথ খুঁজে পেতে পাইলটদের সাহায্য করে খুবই। মনে রাখা দরকার, ওই সময়কার প্লেনগুলো খুব বেশি উচ্চতা দিয়ে উড়ত না। তাই ওইসব পথ নির্দেশকারী চিহ্ন দেখতে পাইলটদের তেমন অসুবিধা হতো না।

১৯১৮ সালে প্রথম উড্ডয়নরত দুই উড়োজাহাজের মধ্যে ঘটে মুখোমুখি সংঘর্ষ। ঘটনাটা ঘটেছিল নেদারল্যান্ডসে। উড্ডয়নরত দু'টি বিমানের চার আরোহীর সবাই প্রাণ হারাল। ওই সময় পর্যন্ত এ্যারোপ্লেন চালানোর ব্যাপারে তেমন কোন নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ ছিল না। ফলে নিরাপদ উড্ডয়নের বিষয়টি নিয়ে যাঁরা চিন্তাভাবনা করছিলেন, তাঁরা বললেন, আর কোন হেঁয়ালি নয়। অবিলম্বে চালু হলো উড্ডয়নরত দু'টি প্লেনের মধ্যে নিরাপদ দূরত্ব নিশ্চিত করার আইন, মুখোমুখি এগুতে থাকা দু'টি প্লেনের পাশ কাটানোর নিয়ম ছাড়াও এ ধরনের আরও বেশ কিছু নিয়মকানুন।

১৯৪০ সালে আমেরিকায় বেসামরিক বিমান চলাচলের ব্যাপারটি নিয়ে আসা হলো দু'টি বিভাগের নিয়ন্ত্রণে। প্রথমটি Civil Aviation Administration (CAA) এবং দ্বিতীয়টি Civil Aeronautics Board (CAB) । এই দু'টি বিভাগই বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও পাসের মাধ্যমে গ্রহণ করে বিমান চলাচলের নিরাপত্তা বিধানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতেই শত্রু বিমান শনাক্ত করার জন্য শুরু হয় রাডার (RADAR) প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার। এই সময়েই প্লেনগুলোকে সাহায্য করার জন্য বেসামরিক বিমানবন্দরগুলোতে বসানো হলো সার্ভিল্যান্স বা অনুসন্ধানী রাডার। আরেক ধরনের রাডার, সেটাকে প্রিসিশন রাডার (Precision Radar) বলা হয়, বসানো হলো প্লেনগুলোকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ল্যান্ডিংয়ে

সাহায্য করার জন্য। এসব রাডার কন্ট্রোল করতেন এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা। এগুলোর পাশাপাশি উড়োজাহাজে সংযোজন করা হলো ওয়েদার রাডার, যা তাকে খারাপ আবহাওয়া এড়িয়ে চলতে ভীষণভাবে সাহায্য করে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে পাওয়া গেল অসংখ্য বৈজ্ঞানিক, যারা শুধু এ্যারোপ্লেনেরই নয়, রকেট প্রযুক্তি বিদ্যাকেও অনেক অনেক দূর অগ্রসর করার ভেতর দিয়ে মানব সভ্যতাকেই অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে।

যুদ্ধের পর শান্তি প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ গঠিত হলো জাতিসংঘ। এই বিশ্বসংস্থারই অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হলো International Civil Aviation Organization যা সংক্ষেপে ICAO। এই সংগঠন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উড্ডয়ন সংক্রান্ত আইনের সমন্বয় সাধন করে থাকে। বাংলাদেশও এই সংগঠনের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর অন্যতম। এই সংগঠন সদস্যভুক্ত দেশগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা করার পাশাপাশি এয়ারলাইনের নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধানে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে।

বিংশ শতকের পাঁচের দশকের মাঝামাঝি আকাশপথে চলাচল শুরু করে বড় বড় যাত্রীবাহী জেট প্লেন। একদিকে ধীরগতির পিস্টন ইঞ্জিনযুক্ত এ্যারোপ্লেন, পাশাপাশি অতি দ্রুতগামী জেট প্লেন –সবকিছু মিলিয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের ওপর সৃষ্টি করল প্রচণ্ড চাপের। ফলে কন্ট্রোলারদের, বলতে গেলে গলদঘর্ম হবার দশা। শত্রু বিমান শনাক্ত করার জন্য এতদিন রাডার প্রযুক্তিকে গোপন করে রাখা হয়েছিল। এবার সেই নিশ্ছিদ্র গোপনীয়তার অবসান ঘটিয়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের এ্যারোপ্লেনের নিরাপত্তা বিধানে রাডার ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হলো। আগে ATC-র লোকজন পাইলটদের দেয়া নিজেদের অবস্থান রিপোর্ট, ম্যাপ আর প্লেনের গতির হিসেবের অঙ্ক কষে প্লেনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করত অনেকটা অন্ধের মতো করে। এবার রাডার স্ক্রীনে প্লেনের নিশ্চিত তাৎক্ষণিক অবস্থান দেখে তার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলো।

আরও কয়েক বছর পার হতেই সার্ভিল্যান্স রাডারের সঙ্গে যুক্ত হলো সেকেন্ডারি সার্ভিল্যান্স রাডার (Secondary Surveillance Radar)। তারও পরে যুক্ত হলো কম্পিউটার প্রযুক্তি। এসব কিছুই এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের দক্ষতা বাড়িয়ে দিল অভাবিত রকমে। বস্তুত অত্যাধুনিক এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে দক্ষ এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা হলেন পাইলটদের বিশ্বস্ততম বন্ধু। পাইলটদের কাজকে তাঁরা করে দিলেন সহজসাধ্য।

অবশ্য তাঁরা যতই অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করুন না কেন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের মন ও নার্ভের ওপর যে পরিমাণ চাপ পড়ে, তার কোন তুলনা নেই। ইউরোপ ও আমেরিকার ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলোতে প্রতি মিনিটে একটি করে এ্যারাপ্লেন ল্যান্ড অথবা টেকঅফ করে, তাই একই সঙ্গে একাধিক রানওয়ে ব্যবহার করতে হয়। এত এত এ্যারোপ্লেনের দিকে যথাযথভাবে নজরদারি করা এবং নির্ভুলভাবে নির্দেশ দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। ফলে এ কাজ করতে গিয়ে মন ও নার্ভের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে বলে যত রকমের পেশাজীবী আছে, তাদের মধ্যে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা হৃদরোগ এবং পেটের আলসারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন সবচেয়ে বেশি। আমার সুদীর্ঘ ফ্লাইং জীবনে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছি আমি ইউরোপ-আমেরিকার ব্যস্ততম বিমানবন্দরগুলোর কন্ট্রোলাররা ধারাবাহিকভাবে প্লেনগুলোকে একের পর এক স্পষ্ট ভাষায়, সংক্ষিপ্ততম কথায়, কোন রকমের তোতলামি ছাড়া কেমন করে নির্দেশ দিচ্ছেন, সেই কথা ভেবে। ব্যাপারটা বেশ কঠিন।

আগের দিনে আমরা, পাইলটরা ল্যান্ড করতে এসে হিসেব করতে শুরু করে দিতাম, কতদূর থেকে নিচের দিকে নামতে শুরু করব, এ্যারোপ্লেনের গতিবেগ রাখব কতখানি এ রকমের আরও অনেক কিছু। এখন আর ইউরোপ-আমেরিকার বিমানবন্দরগুলোতে ল্যান্ড করতে গেলে, ওসব হিসেব করতে হয় না। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররাই নির্দেশ দেন কখন নিচের দিকে অবতরণ শুরু করতে হবে। তার পর অনবরত নির্দেশ দিতে থাকেন, কখন কত উচ্চতায় নামতে হবে, গতিবেগ কত করতে হবে, কোন্‌দিকে দিক পরিবর্তন করতে হবে। এসব নির্দেশ পালন করতে করতেই পাইলটরা এক সময় দেখতে পান, তার সামনেই রানওয়ে। তখন ল্যান্ড করার ব্যাপারটা হয়ে যায় একদম পানির মতো।

এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা এসব কিছু করেন ট্রান্সপন্ডার নামের সেকেন্ডারি রাডারের সাহায্যে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের আকাশপথই ট্রান্সপন্ডারের আওতাধীন। কন্ট্রোলাররা যন্ত্রটির কল্যাণে সব উড়োজাহাজের চলাচল (উচ্চতাসহ) দেখতে পান। উপরন্তু বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরে আরন্যাভ বা এরিয়া নেভিগেশন সিস্টেমের প্রচলন করা হয়েছে। এটা আইএনএস/আইআরএস এসব যন্ত্রের সাহায্যে অনুসরণ করা হয়। ফলে কন্ট্রোলারদের কাজের চাপ অনেকটাই কমে গেছে। তারা শুধু পর্যবেক্ষণ করেন, প্লেনগুলো ঠিকঠাক পথ অনুসরণ করে ল্যান্ড করার জন্য নির্দিষ্ট রানওয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি-না। অথবা টেকঅফের পর নির্ধারিত পথ অনুসরণ করে গন্তব্যের দিকে যাচ্ছে কি-না। এবার আর এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের কথা নয়। এবার এ্যারোপ্লেনের নিরাপত্তা বিধানে আবিষ্কৃত দু'একটি অত্যাধুনিক যন্ত্রের কথা খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব।

ট্রান্সপন্ডারের আর এক ধাপ উন্নত সংস্করণ হলো ACAS বা TCAS। এ্যাকাস হলো : Airborne Collision Avoidance System. বাংলায় বলা যেতে পারে, আকাশ পথে সংঘর্ষ এড়ানোর যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে আমেরিকায় বলা হয় টিক্যাস : Traffic Avoidance System।

ট্রান্সপন্ডার হলো ভূমির রাডার সংস্থান থেকে উড্ডয়নরত আকাশযানকে শনাক্ত করা, তার অবস্থান, উচ্চতা ইত্যাদি নির্ণয় করা। টিক্যাস বা এ্যাকাস যন্ত্রের কাজ হলো, এর সাহায্যে উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেন থেকে অন্য উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেনের দূরত্ব ও উচ্চতা ইত্যাদি জেনে নেয়া। দু'টি উড্ডয়নরত বিমান যদি টিক্যাস বা এ্যাকাস সংবলিত হয়, তা হলেও দুটো বিমানের আলোচিত যন্ত্রগুলো নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে একে অপরের দূরত্ব, অবস্থান ও উচ্চতা জেনে নেয়। যন্ত্র, অর্থাৎ টিক্যাস আবার পরস্পরের মধ্যে তথ্য বিনিময় করে কীভাবে করে এবং সেটা সম্ভবপর হয় একটা যন্ত্রের রাডার পালস্ (Radar pulse) অন্য যন্ত্রের রাডার গ্রহণ করে রিটার্ন পাঠিয়ে দেয় বলে। ফলে একে অপরের দূরত্ব ও উচ্চতাসহ প্রতিচ্ছবি নিজেদের স্কোপে দেখতে পায়।

উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেনের যন্ত্রগুলো তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের চিত্রায়িত ছবি দেখতে পায় বিভিন্ন রঙ আর আকৃতিতে। দু'টি সামনাসামনি অগ্রসরমান প্লেনের নৈকট্য যথেষ্ট হলে এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিলে, ওই যন্ত্রের কণ্ঠ বার্তায় ঘোষিত হয় ট্রাফিক, ট্রাফিক, ট্রাফিক। ঘোষিত ওই বার্তা শুনে পাইলটরা সতর্কতা অবলম্বন করবে। আর নৈকট্য খুব বেশি হলে এবং অগ্রসরমান প্লেনের মধ্যে সংঘর্ষের সমূহসম্ভাবনা দেখা দিলে টিক্যাস যন্ত্রের কম্পিউটার হিসেব করে ঘোষণা করে, ডিসেন্ড, ডিসেন্ড অথবা ক্লাইম্ব, ক্লাইম্ব এবং কী গতিতে নিচে নামতে বা উপরের দিকে উঠতে হবে ভার্টিক্যাল স্পীড ইন্ডিকেটরের (VSI) মাধ্যমে তার যথাযথ নির্দেশ দেয়। বিপন্মুক্ত হতে অর্থাৎ সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য পাইলটদের শুধু ওই নির্দেশ মেনে উপরে উঠতে বা নিচে নামতে হয়। সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূরীকরণ সম্পন্ন হলে টিক্যাস যন্ত্রের কণ্ঠবার্তায় ঘোষিত হয়–ক্লিয়ার অব কনফ্লিক্ট (Clear of conflict). অর্থাৎ বিপন্মুক্ত এবার।

উন্নতমানের প্লেনের কাঠামো, খুব নির্ভরশীল ইঞ্জিন, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের দক্ষতা, বিভিন্ন ধরনের রাডার যন্ত্র, ট্রান্সপন্ডার, এ্যাকাস/টিক্যাস যন্ত্র–এসবের সাহায্যে আকাশপথে ভ্রমণ যথেষ্ট নিরাপদ হলো। কিন্তু এর পরেও দেখা গেল এ্যারোপ্লেন বড় বড় দুর্ঘটনার কারণে সব যাত্রী সমেত বিধ্বস্ত হচ্ছে। আর এসব বড় দুর্ঘটনা ঘটছে পাইলটদের ভুলের জন্য।

বর্তমানকালে এ্যারোপ্লেনের দুর্ঘটনার আশি শতাংশই ঘটছে ল্যান্ডিং এবং টেকঅফ করার বিভিন্ন পর্যায়ে এবং তাও ঘটছে পাইলটদের ভুলের নিমিত্তে।

এবার হিউম্যান এরর (Human Error), পাইলটদের ভুল যাই বলি না কেন, তা দূর করার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা শুরু হলো। বিচার-বিশ্লেষণ শুরু হলো, কেন পাইলটরা এমনসব ভুল করে যা তাদের এবং যাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে। কেমন করে ভুল থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাদের আগে থেকে সতর্ক করে দেয়া যায়?

পাইলটদের ভুলের জন্য প্রথমেই শনাক্ত করা হলো, তারা সবকিছু নিয়মশৃঙ্খলা অনুযায়ী করে না। এছাড়াও আছে ক্যাপ্টেনদের অহংবোধ এবং অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাস যা বড় দুর্ঘটনার প্রধান উপাদান বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এর জন্য নিয়ম করা হলো, ক্যাপ্টেনরা ডিক্টেটরের ভূমিকা পালন করবে না। তারা অন্য ক্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে এবং বিপদকালীন সময়ে তাদের মূল্যায়নকে উপযুক্ত হলে মেনে নেবে। এটাকে বলা হয়, সিআরএম (CRM=Crew Resource Management)। ক্রুদের আরও একটি বিষয়ে মান্য করে চলতে হবে। এটা হলো এসওপি অনুসরণ করা। SOP (Standared Operating Procedure)। এ বিষয়টা বর্তমানে পাইলট হতে হলে যে সব সাবজেক্টে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সিআরএম এবং এসওপি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করার ফলে দুর্ঘটনার হার অনেক কমে গেল। কিন্তু এর পরেও পাইলটদের অবস্থানগত অসচেতনতার কারণে মাঝেমধ্যে দেখা গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটছে।

দেখা গেল, এ্যারোপ্লেন অনভিপ্রেতভাবে চলে এসেছে একটা উঁচু পাহাড়ের কাছাকাছি। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলট জানেন না ওই পাহাড় কতটা কাছে? কেবল খারাপ আবহাওয়াই নয়, ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্লাইংয়ে অদক্ষতা, যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ না করতে পারা এবং চরম ক্লান্তির কারণে তার মানসিক সচেতনতা কমে যাওয়ার মতো কারণেও পাইলট তাঁর এ্যারোপ্লেনের অবস্থান সম্পর্কে অসচেতন

হতে পারেন। অথবা দেখা গেল ল্যান্ড করতে গিয়ে এ্যারোপ্লেন রানওয়ের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে। আবহাওয়া খারাপ থাকায় রানওয়ে বেশি দূর বা বেশি উচ্চতা থেকে দেখা যাচ্ছে না। পাইলট ল্যান্ড করার জন্য আইএলএস (ILS : Instrument Landing System) ব্যবহার করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসছেন। কিন্তু দক্ষতার অভাবে অথবা অসাবধানতার কারণে আইএলএস-এর গ্লাইড স্লোপ (Glide Slope) থেকে অনেক নিচে নেমে গেছেন। এসব কারণেও এ্যারোপ্লেন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেতে পারে কিংবা গ্লাইড স্লোপ থেকে অনেক নিচে নেমে যাওয়ার ফলে রানওয়েতে পৌঁছানোর আগেই ভূমিতে পতিত হয়ে পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ রকমের দুর্ঘটনার শিকার হয়ে ক্রু এবং যাত্রীসহ প্রায় সবারই প্রাণহানি ঘটার কথা। তাই এ্যারোপ্লেনের অবস্থানগত অসচেতনতার কারণে বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি হলে, পাইলটদের সতর্ক করে দেয়ার জন্য ১৯৭০ সালের দিকে তৈরি করা হয় জিপিডব্লিইএস (GPWS : Ground Proximity Warning System) নামের যন্ত্র।

উড্ডয়নরত এ্যারোপ্লেনের উচ্চতা মাপা হয় অল্টিমিটার (ইর্ফধবর্ণণর) নামের যন্ত্রের সাহায্যে। সাধারণ অল্টিমিটার যন্ত্র তৈরি করা হয় ব্যারোমিটারিক প্রেসারের ভিত্তিতে। তাই এটাকে প্রেসার অল্টিমিটারই বলা হয়।

এ ধরনের অল্টিমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এ্যারোপ্লেনের যে উচ্চতা মাপা হয়, সেটা করা হয় সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর থেকে, ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে নয়। হিমালয় পর্বতের ওপর দিয়ে এ্যারোপ্লেন যদি একত্রিশ হাজার ফুট উচ্চতা বজায় রেখে উড়তে থাকে, তা হলে তা হবে ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দু'হাজার ফুটের উচ্চতা। তাই ভূপৃষ্ঠ থেকে এ্যারোপ্লেন ঠিক কতটা উচ্চতায় ফ্লাই করছে, প্রেসার অল্টিমিটার সেটা সব সময় নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারে না। পাহাড়-পর্বতময় অঞ্চলের ওপর দিয়ে ফ্লাই করার সময় অবশ্যই পারে না।

সবধরনের আধুনিক উড়োজাহাজেই আর এক ধরনের অল্টিমিটার যন্ত্র আছে। ওগুলোকে বলা হয় রেডিও অলটিমিটার। প্রকারান্তে এটা Radar Altimeter। এটা আপেক্ষিক উচ্চতা মাপার একটা যন্ত্র। এটা উড্ডয়নের সময় তাৎক্ষণিকভাবে নিচের ভূমি থেকে এ্যারোপ্লেনের উচ্চতা (Vertical height) নির্দেশ করে। এই রেডিও অল্টিমিটারও সামনে পাহাড় বা উচ্চ ভূমিজাতীয় কিছু আছে কিনা, সেই তথ্য দিতে পারে না। কিন্তু এ্যারোপ্লেন যখন টেকঅফ বা ল্যান্ড করে, তখন এই যন্ত্র নিরাপত্তা বিধানে যথেষ্ট সহায়কের ভূমিকা পালন করে থাকে।

১৯৭০-এর দশকে রেডিও অল্টিমিটারকেই ভিত্তি করে তৈরি করা হয় GPWS নামের অতীব প্রয়োজনীয় যন্ত্র। উড্ডয়নরত অবস্থায় উড়োজাহাজ বিপজ্জনকভাবে উচ্চ ভূমির নিকটবর্তী হলে এই যন্ত্র কণ্ঠবার্তার মাধ্যমে Terrain, Terrain, Whoop, Whoop বলে পাইলটকে সতর্ক করে দেয়। এছাড়াও ল্যান্ড করতে এসে সঠিক উচ্চতা থেকে এ্যারোপ্লেন অনেক নিচে নেমে গেলেও ভুল সংশোধন করার জন্য ওই যন্ত্রের কণ্ঠবার্তা তার নির্দেশ দিয়ে থাকে। যদি ল্যান্ড করতে এসে ককপিট ক্রু ল্যান্ডিং গিয়ার বা চাকা নামাতে কিংবা যথাযথ ফ্ল্যাপস্ নামাতেও ভুলে গিয়ে থাকে, তখনও GPWS-এর কণ্ঠবার্তা সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে ভুল করবে না। টেকঅফ করার পর এ্যারোপ্লেন উপরের দিকে উঠতে থাকে, এটাই স্বাভাবিক; কিন্তু কোন কারণে যদি উপরের দিকে ওঠা বন্ধ করে এ্যারোপ্লেন সামান্য পরিমাণেও নিচে নামে বা নামতে থাকে, GPWS তা হলেও পাইলটকে অবশ্যই সতর্ক করে দেবে।

GPWS যন্ত্র বাধ্যতামূলকভাবে উড়োজাহাজে সংযোজনের আইন বিধিবদ্ধ করা হয় ১৯৮২ সালে। অনতিবিলম্বে এর শুভ ফল ফলতে দেখা যায়। GPWS যন্ত্র সংযোজনের ফলে প্লেনদুর্ঘটনা অর্ধেক কমে যায়।

১৯৯০ সালে (CFIT) সিফিট নামের একটি প্রক্রিয়া সংজ্ঞায়িত করা হয়। CFIT অর্থ Controlled Flight Into Terrain। পাহাড়-পর্বতময় উচ্চভূমিতে বা এর কাছাকাছি বিমানবন্দরগুলোতে ফ্লাইট করার ফলে যে দুর্ঘটনা ঘটে, ওগুলো এই সিফিট সংজ্ঞায়িত ফ্লাইটের মধ্যে গণ্য করা হয়। GPWS এই সিফিট জাতীয় দুর্ঘটনা কমিয়ে আনলেও সম্পূর্ণ স্বস্তি এনে দিতে পারেনি। GPWS-এর কিছু সীমাবদ্ধতাই এর জন্য দায়ী। ফলে শুরু হয় কিভাবে যন্ত্রটির উন্নতি সাধন করা যায়, সে ব্যাপারে গবেষণা। আকাশ বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে অল্পকালের মধ্যেই এ ক্ষেত্রে অর্জন করলেন অভাবনীয় সাফল্য। এবারে GPWS যন্ত্রের আধুনিকায়ন করে নাম রাখা হলো EGPWS বা Enhanced Ground Proximity Warning System.

আধুনিকায়িত EGPWS-এর যাবতীয় সতর্কীকরণ পদ্ধতি অপরিবর্তিত রেখেও এর অনেক পরিবর্তন পরিবর্ধন করা হলো। পৃথিবীর প্রাকৃতিক বন্ধুরতা এবং মানুষের তৈরি সুউচ্চ বস্তুসমূহের তথ্য EGPWS-এর কম্পিউটার Data Base-এ সন্নিবেশিত করা হলো। ফলে ওই যন্ত্রের স্ক্রীনে সমতল ভূমি এবং পাহাড় -পর্বতসহ উচ্চ ভূমির প্রতিচ্ছবি পাওয়া সম্ভব হলো। EGPWS যন্ত্রের স্ক্রীনে রিটার্ন প্রতিফলিত হয় নীল, সবুজ, হলুদ এবং লাল এই চার রঙে। নীল হলো জলাধারের প্রতিচ্ছবি, সবুজ হলো বিপদ নেই এমন সমতল ভূমি, হলুদ রিটার্ন বলে দেয় সামনেই আছে সাবধান হবার মতো উঁচু ভূমি। সবার শেষে লাল রঙের রিটার্ন বিপজ্জনক উঁচুস্থান বা বস্তু যে সামনে আছে, বলে দেয় সেই কথা। সুতরাং, খুবই সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুতে থাকো।

উড্ডয়নরত উড়োজাহাজের পরিবর্তিত অবস্থান অনুযায়ী EGPWS যন্ত্রের স্ক্রীনে প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবিও পরিবর্তিত হতে থাকে। উড়োজাহাজের উচ্চতার ওপর নির্ভর করে ভূমির বিপদ সঙ্কেতসূচক রঙেরও পরিবর্তন হতে থাকে। যদি ওই যন্ত্রের কম্পিউটার হিসাব করে বের করে এই সঙ্কেত বা হুঁশিয়ারি দেয় যে, আর মাত্র এক মিনিট সময় এ্যারোপ্লেনের বর্তমান গতিপথ এবং উচ্চতা অক্ষুণ্ন থাকলে সম্মুখের ভূমির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটবে, তা হলে সম্মুখের ওই ভূমির প্রতিচ্ছবি লাল রঙ ধারণ করবে এবং কণ্ঠবার্তায় 'Terrain' শব্দ ঘোষিত হবে। একইভাবে প্লেন অগ্রসর হতে থাকলে ৭ সেন্ডে পরে আবার উচ্চারিত হবে একই সতর্কবাণী। এর পরও যদি দিক বা উচ্চতা পরিবর্তন না করার হয়, তাহলে সম্ভাব্য সংঘর্ষের ত্রিশ সেকেন্ড আগে থেকে অনবরত সতর্ক বাণী অর্থাৎ Terrain, Terrain এবং "Pull up, pull up" নির্দেশ চলতে থাকবে। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিপন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই হুঁশিয়ারি সঙ্কেত দেয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না।

EGPWS সব আধুনিক উড়োজাহাজে সংযোজিত হয়েছে। না হয়ে থাকলে, সর্বশেষ তারিখ ছিল এ বছর অর্থাৎ ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসের সময়সীমার মধ্যে সব উড়োজাহাজেই সেটা করতে হবে বাধ্যতামূলকভাবে। EGPWS সংযোজিত হওয়ার পরে সিফিট (CFIT) এবং এ্যাপ্রোজ এবং ল্যান্ডিংয়ের সময়ের দুর্ঘটনা ন্যূনতম সংখ্যায় নেমে আসবে। কিন্তু আকাশ বিজ্ঞানের অভিধানে আত্মতুষ্টি বলে কিছু নেই। তাই সিফিট, এ্যাপ্রোজ এবং ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনাকে নির্মূল করার জন্য আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হয়েছে। আর এই ব্যবস্থার নাম করা হয়েছে 'এম-স (M SAW—Minimum Safe Altitude Warning)।

ঋঐঘেও যেমন পাইলটকে সতর্ক করে দেয়, 'এম-স' সতর্ক করে দেবে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারদের। যেমন কোন এ্যারোপ্লেন ল্যান্ডিং করতে এসে অসাবধানতাবশত স্বাভাবিক উচ্চতা থেকে অনেক নিচে নেমে গেল এবং এ্যারোপ্লেনটা দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা ট্রান্সপণ্ডারের মাধ্যমে সেটা দেখতে পাচ্ছেন এবং পেলে অবশ্যই তারা রেডিও টেলিফোনের মাধ্যমে পাইলটদের জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু মনে করা যাক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ট্রান্সপণ্ডারের স্ক্রীন থেকে কোন কারণে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছেন। এমন অবস্থায় প্লেনটা বিপজ্জনক উচ্চতায় নেমে গেলে এম-স 'M SAW' ব্যবস্থা সতর্কবাণী উচ্চারণের মাধ্যমে ট্রাফিক কন্ট্রোলারকে সাবধান করে দেবে এবং কন্ট্রোলার তখন পাইলটকে সতর্ক করবেন। আকাশপথে ভ্রমণ নিরাপদ করার জন্য কত রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যে তা সবটা উল্লেখ করতে গেলে বিশাল আকারের একখানা গ্রন্থ রচনা করতে হবে। আমাদের দেশে লঞ্চডুবি হলে মন্ত্রী যেমন 'আল্লাহ্র হুকুমে লঞ্চ ডুবে গেছে' বলে দায় এড়ানোর হাস্যকর চেষ্ট করেন, আকাশ বিজ্ঞানীরা এবং আকশপথকে নিরাপদ রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা এমন কিছু অবশ্যই করেন না এবং কখনও করবেন না।

এ ছাড়া বিশ্ব সংস্থা যেমন ICAO আকাশপথে চলাচলকে নিরাপদ করার যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমাদের মতো দেশগুলোতে সরকারী এয়ারলাইনের অদক্ষ পাইলটদের রিক্রুটমেন্ট বন্ধ বা তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপ বন্ধ করার কোন পন্থা এখনও উদ্ভাবন করতে পারেনি। তাই আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে বিমান সংস্থাগুলোর পাইলটদের অদক্ষতা সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব হবে না।

চৌহদ্দি

হাবীবুল্লাহ সিরাজী

১

বৃদ্ধি ও হ্রাস খাটা সর্বনাশে তাপ দিয়ে
বাজেট বক্তৃতা দেন মন্ত্রী। যন্ত্রী দোতারা বাজায়।
খালপাড়ে ডিম ছাড়ে পুঁটি, আড়ে-আড়ে
বাড়ে ধন্ধ, পাতায়-পাতায় ফোটে রেণু, দানাদার শিষে

আহ, ফি-বছর মাছ-ভাত, সমৃদ্ধ সংসার!
পাট ও পটল নিয়ে যতো দ্বন্দ্ব তার খন্দে আগাম ভর্তুকী
তেজারতি শেষ হ'লে শিক্ষা-স্বাস্থ্য মুখ বুজে উঠোনে জিরোয়;
উন্নতির কতো ভার, খোলা চারে হাফ ধরে ফুসফুস ও মেধায়।
ফিতে-বাঁধা পার্লামেন্ট সারিসারি তথ্যের ফোকড়ে
কাঠ জ্বেলে মৌমাছি তাড়ায়; আমাদের মধুমিয়া বন্দুক ফুটায়।
২
পঞ্চগড়-ভাঙ্গা, খুব দূর? —কী দরকার মাথাঘড়ি
জন্মের দিনেই কারও মৃত্যু হ'লে পাল্টা গাঙে
বিশ্বব্যাংক জাল টানে। পেছনে গ্যাসের শিশি
চাবি খুলে ধাক্কা মারো, ছাগলের ফাঁস
কাঁটায় লটকে যাবে—বারোর ওপরে কোনো দাগ নেই।
তেলের বাহাস দেখে মটর ও স্যেলুলার
খোসা খুলে পেঁয়াজের ঝাঁজে দোস্তি করে, মস্তি চলে চকের হাওয়ায়
পারদের ওঠা-নামা কোনো বিষয়-ই-নয়, —যতোক্ষণ পেরেকের মাথা
কাঠ-লোহা ঠিকঠাক বোঝে, জুন জানে শীতাতপ মাপ;
খুব কি কঠিন হচ্ছে কৃষকের নুন-ঘামে বাঙালীর চৌহদ্দি মেলানো?

আন্দামান

বদরুল হায়দার

শ্যামচরণের পায়ে পায়ে নাচে শাস্ত্রজ্ঞান
বিনা তারে পরপারে হারাই জীবন।

নাশকতা তোমার ডুবন্ত ডিগবাজি
রহস্যের অস্তাচলে তোলে জল কল্‌কল।
ফলাফল শূন্যতায় বাধে পূর্ণতাকে
আমি গমনাগমনে আচরণে তোমাকে জড়াই।
তুমি ফুল ফোটার আনন্দে
বাসপতি ধানে আনো শষ্যের সুঘ্রাণ।
কূলভেঙে কামনার জলেভাসে অসদাচরণ
পালে তালভুলে হাসে আন্দামান।

সাদা জ্যোৎস্না ঘুম নামে

বাদল ঘোষ

সাদা জ্যোৎস্না ঘুম নামে চোখের তারায়
জ্যোৎস্নার নির্যাস ঝরে টুপটাপ
জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না খেলা হবে ঘুমের বদলে
ঘুম ঘুম খেলা হবে জ্যোৎস্নার বদলে।
জ্যোৎস্নার মোম গলে স্নায়ুর গহনে
এসো দু'হাতে বিশুদ্ধ জ্যোৎস্না পান করি
শ্রাবণ আকাশে ছিলো না সেদিন বৃষ্টি
ভরা পূর্ণিমার আলো আঁকে রাত্রির প্রচ্ছদে
অলৌকিক রাজহাঁস। মস্ত রাজহাঁস
পিঠের প্রদেশে বলিষ্ঠ জ্যোৎস্নার মাখামাখি
ঘুম আর জ্যোৎস্না হাত ধরে পাশাপাশি
হেসে ওঠে দমকা হাওয়ার মতো।
সেদিন আকাশে ঝরেছিলো বৃষ্টির বদলে জ্যোৎস্নার নির্যাস
সেই নির্যাসে খেলেছিলো দু'জনে তা-থই তা-থই
আজও খেলবে দু'জনে তেরে কেটে তা...তেরে কেটে তা

বৃষ্টির বদলে ঝরে মিহি জ্যোৎস্নার অজস্র ফুল
নিস্তব্ধ আকাশ। ঘুম ঘুম খেলা হবে
জ্যোৎস্না—জ্যোৎস্না খেলা
অতঃপর আকণ্ঠ দু'জনের জ্যোৎস্নার নির্যাস পান করে
দুধসাদা মিহি জ্যোৎস্নায় হারিয়ে যাবে...

ওফেলিয়া নয় ডেসডিমোনা

ইমরুল চৌধুরী

ত্রপা যেদিন এ বাড়িতে প্রথম এলো
অমিতের মা প্রায় আপ্লুতস্বরে চিৎকার করে উঠলেন
চন্দনের চাবড়া জড়ানো ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দ্যাখো
যেন ঘিয়ের কুসুম ছিটিয়ে সাক্ষাৎ চৌকাঠে পা রেখেছে ওফেলিয়া
অল্পবিস্তর হলেও অমিত অনার্স ক্লাসে সেক্সপিয়র পড়েছে
অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ ওফেলিয়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে-পড়া অমিতের মনে হতো
যেন ওফেলিয়া ওর প্রতিচ্ছায়া নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে
কুসুম নওরিন অথবা আফসানার হাত ধরে
ধূসর বিকালে ভার্সিটির নির্জন কোরিডোর কিংবা কেন্টিনে
যেন সহাস্যে চক্ষুষ্মান হয়ে থাকতো অমিতের
অমিতের দুর্বলচিত্তে আবারও ওফেলিয়া উদ্‌গত হবে এমন আশা করেনি অমিত
সেজদার জায়নামাজে ঈশ্বর বন্দী হওয়ার মতো
প্রার্থিত মনস্কামনা যে পূরণ হতে পারে
অমিত তা ভাবেনি ওফেলিয়া ওফেলিয়া শাশ্বতী ওফেলিয়া
যেন কী এক তন্ময়তার ঘোর কেটে গেলো অমিতের
ত্রপা বাসররাতে চন্দন-চর্চিত পদযুগলে ঘরে প্রবেশমাত্র
বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে অমিত
—সে কি ডেসডিমোনা তুমি এখানে!

নদী এবং কবি

শাহীন রেজা

(কবি আল মাহমুদের ৭০তম জন্মদিনে)
যন্ত্রণার নদী সাঁতরে অহোরাত্র যে নাবিক
সমতটে নোঙর গাড়ে
তার বিনাশ নেই; সে জানে প্রবল ঝড়ের
রাতে 'গাজী-গাজী' বলে বৈঠা চালানোর গোপন মন্ত্র।
কবিরা নাবিক নয়, বৈঠার চেয়ে তীক্ষ্ণ
কলম ঘষে ঘষে যুৎসৎ শব্দের মিল
সে আরও কঠিন।
তবুও কালের যাত্রা অনিমেষ
পথে পথে জীবনের তীব্র অভিজ্ঞতা।
কষ্ট নদীতে আজ সাহসী নাবিক
সত্তর বর্ষণেও অমলিন প্রবীণ কদম।

অন্য ঘরে লখিন্দর

চঞ্চলা চঞ্চু

উনুনে খড়ি পোড়ায় মৃত লখিন্দর ভেলা
গুহার ছাই উছাল করে আগুন ধরে খেলা!
বেহুলা নিভে ভাসায় জলে, কাউ ফলের কুপি
খরস্রোতের মুন্সিয়ানা! মামুর খোলে টুপি।
বেহুলা ঢাকে ক্ষুধায় শাড়ি, আঁচল বাঁধে শাঁখা
যৌবনের সিঁদুর হাসে দু'চোখ ক'রে বাঁকা
ভেলার ক্ষতে জোয়ার নাচে বেহুলা ডাকে স্বামী!
লখিন্দর চেঁচিয়ে বলে অন্য ঘরে আমি।

প্রিয় রোকোনালী

মাকিদ হায়দার

দুঃসময় বৈঠা মারে নৌকো নেই জলে।
যেদিকে তাকাই অন্ধ লোকজন। সাথে
চক্ষু চিকিৎসক, তিনিই কিনবেন গলুইসহ
জলাভূমি, মাঠ জরিপের কাজে যারা আছে মাঠে
তাদেরও কিনবেন, দরদাম ঠিকঠাক প্রায়।
এরই মধ্যে বৈঠা মারে ট্রাক ড্রাইভার
একদা নিপুণ হাতে যার ধরা ছিলো গোলাকার স্টিয়ারিং
সেই লোক দেখি টাঙ্গাইল বাসস্টপেজে হাঁকছে ভীষণ
ভাইসব, দুপুর গড়িয়ে গেলো-একটু পরেই রাত
তারপর?
চক্ষু চিকিৎসক জলাভূমি কেনাবেচা শেষে
দাঁড়ালেন কুমুদিনী হাসপাতালের গেটে ঠিক তক্ষুণি,
দুঃসময় উঠে বসে—গলুইয়ের কাঁধে
বৈঠা গড়ায় একা ধু, ধু, বালুচরে।
ট্রাক ড্রাইভার জ্বালে হেডলাইট
ট্রাকের স্টিয়ারিং-এ হাত রাখে অন্ধ কানারাত
তার সাথে বৈঠা হাতে দুঃসময় একা একাই এগোয় বাংলা মুল্লুকে।

হেলেপড়া পর্বতের ক্লোন প্রক্রিয়া

শামসুল আরেফিন

তোমার সংকল্প ছিলো অনড় দাঁড়িয়ে থাকার
প্রাগুক্তের কোন্ ব্যভিচার জানি না। তোমার দৃষ্টিকে বিদ্ধ করেছে
তোমার কোটর থেকে রক্ত পুঁজ আর পানির প্রবাহ
ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সবুজ কথিত শ্যামল লঘুদের জুমচাষ
তোমার গলিত তরলে মহামারির মিশ্রণ ছিলো
কেউ জেনে কারও অজান্তে তার ব্যবহার
ঘরকে ঘর পাড়া গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে মড়ক
এখানে সময়কে বলা হয় ঘাতক, জীবনকে স্বৈরাচার
তোমার ভ্রূণসিক্ত নিসর্গ ও কোলাহল
তোমার স্পর্শবিহীন সব জন্মই বিনষ্ট হয়ে যায় বিশ্বস্ত গর্ভে
তোমার সংকল্প ছিল নিজস্ব আবিষ্কারে মত্ত থাকার
ভুল গবেষণায় নিশ্চিহ্ন হতেও
কোন পূর্ব শর্ত ছিলো না দলিল দস্তাবেজে
স্থল ও বায়ুসীমা লঙ্ঘন করে
প্রতিটি ভূমিষ্টেই উল্কি আঁকা আছো তুমি
তোমার জোয়াল ফণা তুলে আছে সর্বত্র

বাংলাদেশ

আসিফ নূর

শিয়ালে-কুকুরে আর ভেদাভেদ নাই,
চুক্তিমতে উভয়ের মত্ত মাখামাখি;
'হুক্কাহুয়া' প্রতিরোধে 'ঘেউ ঘেউ' চলে না বলেই
মোরগ প্রজাতি থাকে উৎকণ্ঠায়— হামেশা মৃত্যুর আশঙ্কায়।
লালঝুঁটি মোরগেরা একে একে হয়েছে সাবাড়,
'কুক্কুরুকু' ডাক ভুলে বোবা কষ্টে কেউ কেউ হয়তোবা বাঁচে...
মুরগির পাখার ভাঁজে অসহায় ছানাগুলো কাঁপে থরোথরো;
রাতে নয়— শিয়ালেরা প্রকাশ্যেই হানা দেয় দিনের আলোয়!
বেড়া নাই, ঘরমানুষের কোন সাড়াশব্দ নাই;
ভিটা জুড়ে শূন্যতার নিরাক ক্রন্দন। নিম গাছটির তলে,
মজা-পুকুরের আশেপাশে আর পরিত্যক্ত গোয়ালে-গোলায়

শুধু শিয়ালের পদছাপ—শুধু মোরগের চাবাচোষা হাড়।
ফুটফুটে ছানারা তবু এক টুকরো রোদ দেখলেই
খুদকুঁড়া খোঁটার ঘোরে যেই উঠানে ব্যাকুল ছোটাছুটি ক'রে,
তখনই মেঘের ছায়া উড়ে এসে ঢেকে দেয় আলোর চমক।
অবুঝ ছানার দল উপরে তাকিয়ে দেখে ভয়াল বিস্ময়—
মেঘ নয়!... ওরে মেঘ নয়!...
রোদ-ঢাকা অতিকায় ডানার বিস্তারে
সবদিক কালো করে পশ্চিম দিগন্ত থেকে তেড়ে আসছে যে,
সে এক ক্ষুধার্ত চিল! চোখ লাল, তার ঠোঁট লাল;
কুৎসিত গায়ের রঙ—এ-কী ঘন অমানিশাকাল?

নষ্ট সময়

শ হী দ খা ন

সাবেরার মাথা থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। বোঝাই তো, ইন্টারমিডিয়েটের মেয়েকে গৃহশিক্ষক দিতে গেলে কতকিছু ভাবতে হয়। আজকাল ছেলেমেয়েরা এতটাই ফাস্ট হয়ে গেছে যে, তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা যায় না। আবার ওদের বাসায় টেনে ধরতে গেলেও বিপদ। হিতে বিপরীত হয়। বেশি টাইট দিতে গেলে বাঁধন ছিঁড়ে যায়। ভাবি জানেন, প্রভার বড় বোন দিবা না টিচারের সাথে চইল্যা গেছে।

আশা ভাবির কথা শুনে সাবেরা চোখ কুঁচকে তাকায়।

কোন্ প্রভা? জিজ্ঞেস করে সাবেরা।

আরে ঐ যে মোটা ভাবিটা আছে না, মোহাম্মদপুর বাসা। চিনতে পারেন নাই?

এবার চিনতে পারে সাবেরা। মহিলা ফর্সা ইয়া মোটা। যাকে নিয়ে তারা প্রায়ই হাসাহাসি করে। বিশেষত মহিলার বিশাল স্তনযুগল নিয়ে। মাঝেমধ্যে ব্রা ছাড়াই চলে আসেন স্কুলে। স্কুলের দারোয়ান থেকে শুরু করে সব ব্যাটা ছেলেরা মহিলার বুকের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝেমধ্যে সাবেরার সঙ্গেও কথা বলে। বড় মেয়ে দিবা এ স্কুল থেকেই পাস করে গেছে।

মেয়েটা লেখাপড়ায় ভালই ছিল। এখন আছে ছোটটা। ৭/৮ দিন আগে কথাটা বলেছিল আশা ভাবি। কথাটা শোনার পর নিজের বুকে একটু ব্যথা বোধ করে সাবেরা। শম্পার ব্যাপারে তার মাথা তখন গরম। হঠাৎ করে শম্পার টিচার চলে গেল তখন থেকেই হন্যে হয়ে খুঁজছে একজন গৃহশিক্ষক। ভাবি সাবধানে টিচার রাইখ্যেন। মেয়ের বয়সের কথা চিন্তা কইরেন। আর মেয়েরে ডাইনিং টেবিলে পড়বার দিবেন। যেন আপনের চোখের সামনে থাকে। বিধবা ভাবি বলেছিল কথাটা, অনেকদিন আগে। এটা অবশ্য বলার আগেই সাবেরা করেছে। তার ডাইনিং স্পেসটা ছোট। ছোট হলেও মেয়ে ডাইনিং স্পেসে বসেই পড়াশুনা করে। এতে মেয়েটা সারাক্ষণ তার চোখের সামনে থাকে।

আন্টি আমি আর শম্পাকে পড়াতে পারব না। আমার একটা চাকরি হইছে। সুমন বলে।

সকালে পড়াতে না পারেন রাতে অফিসের পরে পড়ান। সাবেরা বলে।

না আন্টি সম্ভব না। আমার পোস্টিং হইছে ঢাকার বাইরে নরসিংদী। বলেই সুমন সাবেরার দিকে তাকায়।

অ তা দূরে হইলে তো পারবেন না। তা অইলে ভাল দেইখা একজন টিচার দেন।

সুমন জবাব দেয়, আইছ্যা দেখব।

কিন্তু দেখাই সার।

ভাবি এই যে দেহেন, ব্যাডাডা কেমুন কইরাও চাইয়া রইছে। সাবেরা অন্যমনস্ক ছিল এতক্ষণ। হঠাৎ আনু ভাবির কথায় তাকায় তার দিকে। তারপর আনু ভাবির ইঙ্গিতে দক্ষিণ দিকে তাকায়। রাস্তার ওপারে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একটা লোক। তাকিয়ে আছে পাশের এক মহিলার দিকে। ফর্সা, সুন্দরী মহিলার সেদিকে নজর নেই। কথা বলছে অপর এক মহিলার সঙ্গে। রাস্তাভর্তি লোক। কেউ স্কুলের দিকে আসছে; কেউ স্কুল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। কেউবা দাঁড়িয়ে একটু গল্প-গুজব করছে। কতকিছু হয় এখানে। বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে আসা গার্জেনদের মধ্যে বেশির ভাগই মা। বাবারা কম আসে। তারা থাকে অফিস আদালতে। অনেক কাণ্ড এখানে ঘটে। কিছুদিন আগে এক বাচ্চার মা চলে গেছে আর এক বাচ্চার বাবার সঙ্গে। ভাবি আপনিও চিনেন মহিলাডারে। ঐ যে উঁচা-লম্বা, গাঁয়ের রঙডা ইকটু শ্যামলা, সেলোয়ার কামিজ পইর‍্যা আসত। খুউব সাজগোজ করত। আর সব সময় দাঁড়াইত ফাস্টফুডের দোকানটার পিছনে। দুইজনে দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া এক লগে কতা কইত। সাজু ভাবি চশমাটা একটু উপরে তুলতে তুলতে বলে।

এবার সাবেরা চিনতে পারে। হ ভাবি, এইবার চিনবার পারছি। এই মহিলাডা এই কাম করছে?

কেন? আশ্চর্য হইলেন, বলে সাজু। সাজুর সঙ্গে সাবেরার একটু বিশেষ ভাব। তাকে ঘরের কথা বলে। সাজুও বলে। কারো কারো সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। কখন কীভাবে হয়, তারা নিজেরাও জানে না।

কী ব্যাপার গালে দাগ কিসের? বুঝবার পারছি আইজ কাম অইছে। ঠিক না? বলে সাজু তার পিঠে গুঁতা মারে। সাবেরা হাসে। আয়েশি সুখের হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে-মুখে। এ ধরনের কথাবার্তাও হয়। দু'বাচ্চার গার্জেনের স্কুল চত্বরে প্রেম করা এবং পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা স্কুলের বাচ্চাদের গার্জেনদের মুখে মুখে থাকে কতদিন এই শম্পার মা এইখানে বইস্যা থাইক্যা কী হইব?

স্কুল ছুটি হইতে আরও ঘণ্টা-দেড় ঘণ্টা সময় আছে। চলেন লেকের পাড় দিয়া কতক্ষণ হাইট্যা আসি। বলে দিলারা ভাবি। তার সঙ্গে আরও দু'ভাবি। দিলারার কথায় সাবেরা হাতঘড়িতে সময় দেখে। অনেক সময় বাকি স্কুল ছুটি হওয়ার। তার সঙ্গে সানু। দু'জন দাঁড়িয়ে গল্প করছিল। দিলারার ডাকে তারা সাড়া দেয়। আসেন আমার সঙ্গে আপনাদের মূল্যবান দৃশ্য দেখাব। বলে দিলারা তার বিশাল দেহ নিয়ে হাঁটতে থাকে। দিলারা খুব রসিক মহিলা। ফস্ ফস্ করে মুখ ভেঙে সব কথা বলে ফেলে। এই ভাবি আপনার পাছা এত নাচে কেরে? সামলাইয়া হাঁটেন। রুবি ভাবি হাসতে হাসতে বলে। আরে রাহেন তো, অত সামলাইয়া কী হইব। দেখুক না ব্যাডারা। আমার কতা মনে কইরা সুখ পাউক। দিলারার কথায় হাসির রোল ওঠে। এই যে দেহেন ডাইনের ব্যাডাডা কেমনে চাইয়া রইছে আমার বুকের দিগে। মনে হইতাছে ভাইজানে এই জিনিস জীবনে-অ দ্যাহে নাই।

কথা বলতে বলতে তারা পা চালায়। হাল্কা শীত পড়েছে। আগামী ২/৩ সপ্তাহের মধ্যে শীত নেমে যাবে। শম্পার মা তো দেহে নাই। বলে দিলারা সামনে থেকে ঘাড় ভেঙে পিছনে তাকায়। সাবেরা হাসে। বড় রাস্তায় উঠে তারা ফুটপাথ ধরে হাঁটে। বড় রাস্তা পার হয়ে যেতে হবে লেকের পাড়ে। সাবেরার কোন সময় যাওয়া হয়নি। দূর থেকে জায়গাটা সে দেখেছে। বিশেষত লেকের পারের জাহাজের মডেলে করা বাড়িটা দেখেছে দূর থেকে। ঢাকা শহরের নামীদামী হাজার হাজার বাড়ির মধ্যে লাল রঙের ওই বাড়ির বৈশিষ্ট্য অন্যরকম। মনে হয় একটা জাহাজ লেকের ঘাটে নোঙর করে আছে। পোঁ পোঁ করতে করতে একটা বড় বাস তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সাবেরার মাথায় গত কিছুদিন থেকেই চলছিল টেনশন। তার তিনটে বাচ্চা। বড়টা ইন্টারে ভর্তি হয়েছে। নাম শম্পা। শম্পার পরেরটা ছেলে, আবীর। তার পরেরটা মেয়ে। নাম ঋতু। ঋতু এবার ক্লাস থ্রিতে। বাচ্চাদের লেখাপড়ায় খুব সমস্যা। একে স্কুলে আনা-নেয়া করা এক ঝামেলা, তার উপর আছে বাসায় লেখাপড়া করানো। একটার পাছায় একটা পরীক্ষা লেগেই আছে। পরীক্ষার যেন থামতি নেই। আগের সব বিষয়ে ৫০ নাম্বার পেতে হবে। না হলে আউট। সারা বছর থাকতে হয় টেনশনে। শম্পার টিচার নিয়ে তার টেনশন কমেছে। হিন্দু একটা ছেলে দিয়েছে জাপানি ভাবি। বুয়েটের ছাত্র। নাম সুব্রত। ভাবি ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল। অসুবিধা হবে না। মুসলমান হলে তো বোঝেনই, সমস্যা হইতে পারে। বলছিল জাপানি ভাবি। টেলিফোনে, স্কুলে সরাসরি কয়েক ভাবিকে বলেছিল সাবেরা পরিচিত একটা ভাল টিচার দেয়ার জন্য। বিজ্ঞানের বিষয়গুলোর জন্য। ঠিক আছে ভাবি ছেলেটারে আপনে আমার বাসায় পাঠাইয়া দিয়েন।

পরদিনই সুব্রত ফোন করে বাসায় আসে। সন্ধ্যার পর শম্পার বাবা বাসায় থাকে। সে সময়েই সুব্রতকে আসতে বলে। প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে নেয় সাবেরা আর তার স্বামী। তারপর মেয়েকে ডেকে আনে। পরিচয় করিয়ে দেয়। পরদিন থেকেই সুব্রত আসতে শুরু করে। সপ্তাহে ৫ দিনের বেশি পড়াবে না। সময় ২ ঘণ্টা। রাজি হয় সাবেরা।

কই সাবেরা ভাবি কই? কথাটা কে বলল আন্দাজ করতে পারে না সে। তারা ৫/৬ জন এক সঙ্গে হাঁটছে। ভাবি সামনে চাইয়া দেহেন দৃশ্য। হাল্কা ফিনফিনে শীত—বাতাস এসে গায়ে ঝাপটে পড়ে। সাবেরা তাকায় লেকে। লেকের পানিতে ছোট ছোট সিঁড়ির মতো ঢেউ। লেকের পাড়টা খুব সুন্দর করে বাঁধানো। লাইন ধরে বসে আছে ছেলেমেয়েরা। আশ্চর্য এ রকম দৃশ্য তো সে আগে কখনো দেখেনি। একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। অনেক মেয়েছেলের পরনে স্কুল-কলেজের ড্রেস। কারও সঙ্গে স্কুলব্যাগও আছে। ব্যাগটি পাশে অথবা সামনে রাখা, কোন কোন জুটি মাথার উপর কাপড় দিয়ে নিজেদের মুখ আড়াল করে রেখেছে। কেউবা এমনভাবে বসেছে রাস্তা থেকে তাদের মুখ দেখার উপায় নেই। একটা দৃশ্য দেখে সাবেরার পা থেমে যায়। দু'জন দু'জনকে ধরে চুমু খাচ্ছে। ছেলেটির হাত মেয়েটির জামার ভেতর। —শম্পার মা ভালা কইর‍্যা দেইখ্যা লও। একটা মেয়ে তার পাশে বসা ছেলেটির সঙ্গে অভিমান করছে। বার বার মুখ ফিরিয়ে কি সব যেন বলছে। যতই সামনে এগোয় ততই এ রকম দৃশ্য। বাসায় ফিরেও সেদিনের কথা ভুলতে পারে না

সাবেরা। রাতে শম্পার বাবাকে ডেকে বলে, এই শুনছ, যা দেকলাম আজকে, তুমি যদি দেখ না, ফিট হইয়া পইড়া যাইবা। তারপর ঘটনা সব বলে শম্পার বাবাকে। এসব ছেলেমেয়েরা নিশ্চয় স্কুল-কলেজের কথা বলে বাসা থেমে এসে বন্ধুদের লইয়া আড্ডা মারে। বলতে বলতে সাবেরা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে। দিনকাল চেঞ্জ হইয়া গেছে। তুমি কি ভাবছ এখনও আগের দিন আছে? কত ঘটনা ঘটতাছে ঢাকা শহরে জানো? ঐদিন আমার এক কলিগ কইল তার বাসার কথা। তার বাসা ভাড়া দিছে একটা লোকের কাছে। তারা ফ্যামিলি মেম্বার ৩ জন। তারা হাজবেন্ড ওয়াইফ আর একটা ছেলে। দুই তিন মাস পরে হে জানবার পারে তার ভাড়াটিয়ার কাণ্ডকারখানার কথা। তার বাসায় দিব্যি মেয়ে মানুষ দিয়া ব্যবসা করতাছে ভাড়াইট্যা। আসলে তারা স্বামী-স্ত্রী না। বাইচ্যাডাও তারার না। পাতানো সংসার। সাবেরার স্বামী একটানে কথাগুলো বলে থামে।

বাইরের কথা কী বলবে ঘরের পরিবেশই পরিবর্তন হয়ে গেছে। টেলিভিশনে এখন ডিশ চ্যানেলের ছড়াছড়ি। তার লাইনেই তো এক শ'র উপরে আছে চ্যানেল। খুললেই কত রকমের ছবি। ছেলেমেয়েরা এসব দেখছে। তারাও দেখছে। অনেকদিন সাবেরা ডিশ নেয়নি এসবের জন্যই। কিন্তু তার স্বামী এনেছে। এইসব জিনিস তুমি-আমি চাইলেই বন্ধ হইব? হইব না। এইসব মাইন্যাই চলতে হইব। করার কিছু নাই। রিতা ভাবির মেয়েটা কেমন করে ভেগে গেল গৃহশিক্ষকের সঙ্গে। তাও যদি ছেলেটা কিছু করত। বেকার ছেলে, ঢাকা শহরে মেসে থাকে। বাবা-মা দেশের বাড়ি। ভেতরে ভেতরে যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি রিতা ভাবি কিংবা তার স্বামী। রিতা ভাবির মেয়ে নাজকে ওই ছেলে ৫/৬ বছর ধরে পড়াচ্ছে। এ ছেলে যে এমন কাজ করবে ভাবতেও পারে নাই তারা।

ভাবাভাবির দিন শ্যাষ ভাবি। কিছুদিন আগে বলছিল ফরিদা ভাবি। আমার ভাইয়ের মাইয়্যাডা ভাইগ্যা গেল দোহানের কর্মচারীর লগে। দুইন্যাত আর পুরুষপোলা পাইল না। এসব তো আশপাশের লোক মুখ থেকে শোনা কথা, আর পত্রপত্রিকায় আসছে কত খবর! দুদিন আগেও দেখল পত্রিকায়। বাজিতপুরের এক মেয়ে, যে এখনও সাবালিকা হয়নি, এফিডেভিট করে বিয়ে করেছে গৃহশিক্ষককে। বাবা কেস করায় কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে মেয়েটিকে সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়ার। রায় শোনার পর মেয়ে কোর্টে বলেছে যতদিন সে সাবালিকা না হবে ততদিন সে থাকবে জেলে। স্বামীকে ছাড়া সে জেল থেকে বের হবে না।

হায় হায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সূর্য ডুবেছে বেশ আগে। আসছে না কেন শম্পা? একবার ঘড়ি দেখে সাবেরা আর একবার বারান্দায় দাঁড়ায়। একটার পর একটা রিকশা যাচ্ছে, শম্পা আসছে না। শম্পার কলেজ ছুটি হয় পাঁচটায়। এখন তো ছয়টা বাজতে চলেছে। এতো দেরি তো শম্পা করে না। এখন সাবেরা কী করবে? ভর সন্ধ্যায় সে কি বের হবে মেয়ের সন্ধানে? না হয়ে উপায় কী? সাবেরা হাঁটছে লেকের পারে। সঙ্গে দিলারা ভাবি। থমকে দাঁড়ায় সাবেরা। জাহাজ মার্কা বাড়িটার পাশে জুটি বেঁধে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে বসে আসে। তার চোখ স্থির। মেয়েটাকে তার চেনা চেনা মনে হয়। ছেলেটিকেও। একটু উঁকি দিয়ে দেখে– হ্যাঁ, তার ধারণাই ঠিক, শম্পা আর সুব্রত বসে আছে একে অপরকে জড়াজড়ি করে। সুব্রত চুমু খাচ্ছে শম্পাকে। সুব্রতের একটা হাত শম্পার জামার ভেতর। আরে সামনে আসেন আরও ভালা দৃশ্য দেখবার পাবেন। বলে দিলারা। একটা বড় গাছ। বহুদিনের পুরনো গাছটা দেখলেই বোঝা যায়। গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে দুটি ছেলেমেয়ে। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ফিরে আসে সাবেরা। এখন তার দৃশ্য দেখার খায়েশ নেই। তার মেয়ে কিনা এসব করছে। পায়ের স্যান্ডেল খুলে সাবেরা মেয়ের দিকে এগিয়ে যায়। জুতা দিয়ে পিটিয়ে মেয়েকে নিয়ে যাবে বাসায়। শম্পার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় সাবেরা। কোথায় শম্পা? একটু আগে তো এখানেই সুব্রতের সঙ্গে বসে থাকতে দেখল। তাহলে কি তাকে দেখে শম্পা পালিয়ে গেল।

ফোনটা বাজছে। সাবেরা রিসিভার উঠায়। হ্যালো, ওপাশ থেকে এক মহিলার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কে বলছেন? সাবেরা জিজ্ঞেস করে।

আমাকে চিনবেন না। আপনাকে একটা খবর দেয়ার জন্য ফোন করছি।

কী খবর : আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে সাবেরা। নিশ্চয়ই তার মেয়ের খবর।

শম্পার জন্য চিন্তা করবেন না। শম্পা প্রাইভেট টিউটর সুব্রতকে কোর্টে গিয়ে বিয়ে করেছে। এখন আপনার সামনে যেতে সাহস পাচ্ছে না। ওরা ভাল আছে। আমার বাসায় আজ রাত থাকবে। তারপর কট করে শব্দ হয়। ফোনের লাইন কেটে যায়।

শম্পা, শ-ম্-পা। চিৎকার দিয়ে উঠে বসে সাবেরা, ঘরের ভেতর অন্ধকার। ঘুমাচ্ছে শম্পার বাবা। ঘেমে গেছে সাবেরা। বিছানা থেকে নামে। পায়ে পায়ে শম্পার ঘরে যায়। লাইট জ্বালায়। শম্পা ঘুমে। ডাইনিংয়ে এসে এক গ্লাস পানি খায়। বুকটা তখনও কাঁপছে সাবেরার।

দেশ, প্রিয় দেশ

সুলতানা আজীম

স্নো বর্ডিংয়ের সেদিনের শেষ রাউন্ডটি শেষ হয়েছে। অতএব, ওপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছি আমরা। বসন্ত সময়েও তুষার ছাড়া আর কিছু নেই এই আল্পস পর্বতমালা অঞ্চলে। শুভ্রতম এলাকা। ওপরে-নিচে-চারপাশে, যতোদূর দেখতে পাচ্ছো, দেখছো তুষার, তুষার আর তুষার। সমাজতান্ত্রিক নিয়মে বিলিয়ে দিয়েছে সূর্য নিজেকে এখানেও। চিনির গুঁড়োর মতো অনমনীয় এই তুষারকে তবুও পারছে না গলাতে। অপরাজেয় তুষার হাসছে আর হাসছে, আলো ঝলমল বিজয়ের হাসি। আদিগন্ত তুষারের শরীরজুড়ে রোদের এই আদর বর্ণনা করা যাবে কোন্ ভাষায়? কোন্ উপমা, রূপক, চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষায়?

আমি জানি না।

মাইনাস তাপমাত্রাতেও ভিজে গেছি ঘামে। জল ঝরছে শরীরের স্কী পোশাকের ভেতরে তখনও। স্পোর্টস-এর বিধান এটা। স্পোর্টস করবে তুমি অথচ জল ঝরবে না শরীর থেকে, তা কি হয়? হোক ফুটবল, টেনিস, বাস্কেটবল অথবা তুষারস্নাত পর্বতে স্কী, স্নো বর্ডিংসহ যে কোনো খেলা।

অনেকটা নিচে নেমে এলে, প্রথমে যে দৃষ্টিনন্দন রেস্তরাঁটি চোখে পড়ে, গিয়ে বসি ওর বারান্দায়। পুটেন কাটলেট, কিংপ্রন সালাদ, ক্রকেট আর কফির অর্ডার আমার। স্টেক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, সালাদ আর চেরীর জুসের অর্ডার পাপ্পুর।

যথেষ্ট ক্লান্ত থাকার কথা এ রকম স্পোর্টস করার পরে। কিন্তু ক্লান্তি, কেনো কে জানে, অনেকটাই ক্ষমা করেছে আমাদের। ঝরঝরে লাগছে বেশ।

পর্বতের ওপর থেকে নেমে আসছে আমাদের মতো শৌখিন স্পোর্টসম্যানরা। ওপরে উঠছে অনেকে। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ, বিভিন্ন বয়সী মানুষ এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে, এতো এতো দূরে। সময়, শ্রম আর কতো কতো ডলার এবং ইউরো খরচ করে। কি ভীষণ আকর্ষণ এই পর্বতগুলোর! আর এই দিগন্ত বিস্তৃত শাদা শাদা তুষারের! ভেবে অবাক হই।

আলবেয়ার ক্যামুর স্ট্রেন্জার পড়ছিলো পাপ্পু ফ্রেঞ্চ ভাষায়। এ ভাষা অজানা আমার। অনেক ভাষায় ওর সম্পূর্ণ দখল এবং বিচরণ হিংসুটে করে তোলে আমাকে। এ রকম প্রতিভা অথবা আগ্রহ কেনো আমার হলো না? তাহলে অরিজিনাল বা মূল ভাষায় পড়তে পারতাম অনেক বই। মূল ভাষায় পড়তে পারার সুখ যে কি, তা কি বলে বোঝানো যাবে? যে পারে ওভাবে পড়তে, সেই তা জানে।

'দেশের কথা বলো' বইটা বন্ধ করে পাশে রেখে বললো পাপ্পু।

এই পরিবেশে, এমন এক এলাকায়, এই সময়ে, এ কথা সে বলবে, ভাবিনি।

দেশ, সে তো রেখে এসেছি আমি প্রায় বারো হাজার কিলোমিটার দূরে। এমন এক শুভ্র শীতল জগত থেকে কি করে ফিরে যাবো সেখানে? যেখানে তাপমাত্রা পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে এখন। যেখানে ফ্যানের নিচে থেকেও ঘামছে মানুষ। কোন্ ভাষায় বলবো সব কথা, যা দেখে এসেছি।

সে ভাষা কি আয়ত্ত করেছি আমি? আমার খুব সামান্য বাংলা কি যথেষ্ট হবে এক উৎসাহী পরবর্তী প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট করতে আমাদের দেশটির যথার্থ অবস্থা?

আমি তো জানি, দেশটি সম্পর্কে ওর আগ্রহ-উৎসাহ কতো অকৃত্রিম আর কতো আন্তরিক। এমন কোনো বিষয় নেই বাংলাদেশের, যা জানতে চায় না সে। যা শুনতে চায় না সে। কতোটা বলতে পারি আমি তাকে! তবু বলেছি হবু এক মহাকাশ বিজ্ঞানীকে তার পূর্বপুরুষের দেশটির কথা, যখন যতোটুকু পেরেছি।

আজকের এই সন্ধ্যা এবং রাতটির পরে দেখা হবে না অনেক দিন ওর সাথে আমার। আল্পস পর্বতমালার এই জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ও ফিরে যাবে ওর স্টেটের ইউনিভার্সিটিতে। আমি চলে যাবো আমার শহরে, নিজের গড়া জগতে এবং জীবনে।

দু'সপ্তাহ হলো মাত্র ফিরেছি দেশ থেকে। জীবন ডেকে নিচ্ছে আমাকে তার দায়দায়িত্বের কাছে। প্রবেশ করেছি আমার অপেক্ষায় ক্লান্ত খুব পরিচিত সেই কর্মময় এলাকায়। তবু বুকজুড়ে আছে দেশটা।

হারিয়ে যাচ্ছে না সে আমার অনেক অনেক কাজের ভিড়ে এবং ব্যস্ততায়।

খনন করে বের করার মতো করে দেশের খবর বের করে এনেছে পাপ্পু আমার ভেতর থেকে সব সময়। আজকেও করছে একই চেষ্টা।

–বলো আম্মু, কি কি উন্নয়ন চোখে পড়েছে তোমার তেত্রিশ বছর অতিক্রম করে আসা বাংলাদেশে?

–উন্নয়ন? গোটা দেশটার কথা তো বলতে পারবো না। ছিলাম বেশির ভাগ সময় ঢাকায়। ঢাকার কথা হয়তো বলতে পারবো কিছুটা।

ঘরের যে বউটি গত বছরও বলেছিলো, কিছু বোঝে না বলে স্বামীর মোবাইল ফোনে হাত দেয় না সে কখনো, তারও আছে এখন মোবাইল ফোন। খুব গর্বিত সে, এটা তার আছে সে জন্যে।

—কী কারণে এই ফোন তার দরকার? জানতে চায় পাপ্পু।

—যে ক'টা কারণ আমার মনে হচ্ছে তার প্রথমটি হলো, সমান অধিকার। স্বামীর থাকবে আর স্ত্রীর থাকবে না, তা হয় না।

ল্যান্ড ফোন কি প্রিমেটিভ যুগের জিনিস নয় এখন? কেবলমাত্র ল্যান্ড ফোন থাকলে কি আধুনিক হওয়া যাবে আধুনিকতম এই একুশ শতাব্দীতে? মোবাইল ফোনের সাথে আধুনিকতার সম্পর্ক যে অবিচ্ছিন্ন, এটা উদ্ভাবন করতে পেরেছে তারা। যতোই বেশি হোক এর দাম, যতোই ক্ষতি করুক এটা মানুষের ব্রেনের, শরীরের বা পরিবেশের। হোক না চুরি, অথবা নষ্ট বার বার। আবার এবং আবার কিনতে হোক না অনেক টাকা খরচ করে। কোনো আপত্তি নেই। না হোক কিছুমাত্র জরুরী এটা একজন গৃহবধূর জন্যে, কিনতে হবে তবুও। হবেই। সবকিছু সমানভাবে কিনতে পারলেই তো হওয়া যাবে উন্নত আর আধুনিক।

বাজার করতে টাকা লাগে অবশ্যই। টাকার অভাব হয় না তাদের কখনো, যারা পেতে চায় টাকা অনায়াসে। নীতি, ব্যক্তিত্ব আর মানবিকতা ধরনের শব্দগুলোর সাথে পরিচিত নয় যারা, পরিচিত হলেও, এসব জরুরী গুণকে প্রতিদিনের জীবনে প্র্যাকটিস করা কিছুমাত্রও জরুরী মনে করে না যারা, অর্থের অভাব-অসুবিধে হয়নি তাদের কোনো কালে। হয় না এখনও।

একটা আধুনিক পার্টিতে যাবে বউটি। অথবা কোনো অনুষ্ঠানে। অন্য সব মিস্টার-মিসেসদের মোবাইল বাজবে। কল আসবে বার বার। অতিব্যস্ত করে রাখবে মূল্যবান মানুষগুলোর মূল্যবান সময়কে ভীষণ প্রিয় এবং জরুরী মোবাইল। অথচ বউটি বসে থাকবে মোবাইলবঞ্চিত, গুরুত্বহীন অনাধুনিক নারী হয়ে, তা কি হয়?

এ রকম সব আধুনিক জিনিস না থাকার জন্যে সে কি হয়ে যাবে না প্রবল অসুস্থ, মানসিকভাবে? অদৃশ্য, তীব্র, জরুরী এক অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা। বাইরে থেকে অতোটা বোঝা যায় না যদিও। ভয়ঙ্কর এক উপহার এটা বিশ্বায়নের উদ্যোক্তাদের এবং তাদের অনুসারীদের পক্ষ থেকে। যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মুক্তবাজার অর্থনীতির অসীম বিকাশ এবং স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠায়।

কতো নির্মম আর কতোটা অমানবিক এই উপহার, সেটা বোঝা যায় অতিআধুনিক এই বিশ্বায়ন সময়ের নাগরিকদের শরীর আর মনের অবস্থা দেখে।

কেমন আছেন? শরীর কেমন? কি কি অসুখ আপনার? কেনো ভালো থাকছে না শরীর? এ রকম ক'টা জরুরী প্রশ্ন যদি করা হয় ভোগ-উন্মাদ মানুষগুলোকে। যদি জবাব দেন তাঁরা সবটুকু সততায় তাহলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, কোথায় অবস্থান করছেন তাঁরা।

ঘরের এই বউটি, যার আছে যথেষ্ট ধনী এক স্বামী; আছে আধুনিক গাড়ি, বাড়ি। বাড়িটা ভরে আছে আধুনিক বিলাসী জিনিসে, খুব অহঙ্কারী হয়ে উঠেছে যে নিজেকে আধুনিক সমাজের সদস্য মনে করে; সে যখন অর্থ অথবা দামী উপহার নিয়ে নিয়মিত যায় তার পীরের বাড়িতে একের পর এক সমস্যার সমাধান চাইতে, প্রার্থনা করে পীরের দোয়া, কন্যার ভালো রেজাল্টের জন্যে, পুত্রসন্তান জন্মানোর জন্যে, বিভিন্ন নেশার আকর্ষণ থেকে ঋণখেলাপী স্বামীর উদ্ধারের জন্যে, নিজের প্রতি স্বামীর আগ্রহ ফিরিয়ে আনাসহ আরো অনেক অনেক বিপদ অতিক্রম করার জন্যে এবং যখন সে অংশগ্রহণ করে জিকির ধরনের বিভিন্ন প্রার্থনা অনুষ্ঠানে নিয়মিত, তখন সবকিছুই গোলমেলে মনে হয় খুব।

বিশ্বায়ন যখন পৃথিবীকে পরিণত করতে চাচ্ছে একটা গ্রামে; যখন বলা হচ্ছে, আধুনিক নয় কেবল, টেকনোলজিক্যাল ওয়ার্ল্ড অথবা প্রযুক্তির পৃথিবী এখন; যখন ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক উপায়ে প্রযুক্তি এবং ভোগের পণ্য গোটা পৃথিবীতে; ভোগের অগাধ আধুনিক উপকরণ যখন পরিতৃপ্ত হয়ে কিনতে পারছে মানুষ। তখন এতো গভীর হয়ে কেনো নামলো বর্বর এবং মধ্যযুগের অন্ধকার এই পৃথিবীতে? কেনো সে অন্ধকার সবচেয়ে বেশি আচ্ছন্ন করছে দরিদ্র দেশগুলোকে? বলা যায়, গিলে ফেলেছে। এ এক অভূতপূর্ব কন্ট্রাস্ট। এর আগে এমন হয়নি কখনো। কোনো প্রমাণ নেই তার।

যে দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচের ছয় কোটি এবং দারিদ্র্যসীমার একটু ওপরের বেশ কয়েক কোটি মানুষ প্রতিদিনের জরুরী সব খাবার জিনিসও কিনতে পারে না এলাকার কাঁচাবাজার থেকে, সে দেশেই মুক্তবাজারের অবদানে এখানে ওখানে সেখানে, সব জায়গায় জন্ম নিয়েছে এবং নিচ্ছে নতুন নতুন শপিং প্লাজা, মল, কমপ্লেক্স।

এটা অবশ্যই সত্যি, দেশের বেশির ভাগ মানুষ পারে না এসব মল বা প্লাজায় ঢুকতে। কিন্তু তারা পারে অতিআধুনিক (?) এসব এলাকার সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে। সব বয়সের ক্ষুধার্ত মানুষ, মৃত্যুর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধ এবং দু'তিন বছরের শিশুরাও অর্জন করেছে হাত পেতে ভিক্ষে করার নাগরিক অধিকার।

বিশ্বায়নের এই সমৃদ্ধ সময়ে আর পরাজিত হতে চাচ্ছে না এরা ক্ষুধার কাছে। অসামান্য এই গ্রহটি ছেড়ে যাবার আগে পেট ভরে খেতে চাচ্ছে অন্তত একবার, শেষবার। পেট ভরে খাবার পরিবর্তে গাড়ির নিচে চাপা পড়বার সবটুকু ভয় থাকলেও। যানকীর্ণ ভয়াবহ রাজপথের ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় দাঁড়িয়ে হলেও। ভয়কে এরা জয় করেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচের এই জনগোষ্ঠী মার্সিডিজ, বিএমডব্লিউ, ল্যান্ডক্রুজার, ওপেল, টয়োটা গাড়ি, গাড়ির মালিক এবং তাদের পজিশনকে সমীহ না করে আদায় করে নিয়েছে ঝড়, জল, রোদ, বৃষ্টিতে সারাদিন রাজপথে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করতে পারার একমাত্র সৌভাগ্য। ক্ষুধা এমনই এক জিনিস, যা পেটে থাকলে সবকিছুই করতে পারে মানুষ। পারে ছিনিয়ে নিতে, পারে চুরি, ডাকাতি এবং খুনও করতে। তা না করে চেয়ে যে নিচ্ছে এরা, দরিদ্রতম এই দেশটির ভাগ্যবানদের (?) কাছ থেকে, অবিশ্বাস্য সততা কি নয় এটা?

কোনো কোনো রাস্তাকে অবশ্য মুক্ত করা হয়েছে মনোরম এই সব দৃশ্যের আওতা থেকে। যেসব রাস্তা সম্ভবত ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পারসনদের জন্যে। একেবারে গুরুত্বহীন প্রাণীদের দেখে মূল্যবান সময় কি নষ্ট করতে পারে অমন গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা?

রাস্তাগুলোর অবস্থা কি? জানতে চায় পাপ্পু।

—মুক্তবাজার অর্থনীতিকে প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দেবার স্বার্থে শহর-বন্দরের সাথে গ্রামের সড়ক সংযোগ-আগের চেয়ে ভালো হয়েছে অবশ্যই। কিন্তু রাজধানী শহরটির অবস্থা? কয়েকটি ভিআইপি রোড বাদ দিলে এমন একটি রাস্তা দেখিনি, যে রাস্তাটির গোটা শরীর ক্ষতবিক্ষত নয়। একটি রাস্তা দেখিনি, যার এক অথবা দু'পাশে খোলা নর্দমা নেই। কেবল নর্দমা? পচা নোংরা, আবর্জনার স্তূপ, মলমূত্র, কফ, বমি, পানের পিক, গলিত, মৃত প্রাণী—কি নেই রাস্তার দু'পাশে! আরো আছে প্রায় প্রতিটি রাস্তায় ঢাকনা চুরি হয়ে যাওয়া খোলা ম্যানহোল। আছে অনবরত রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, কাটাকাটি। কালো ধোঁয়াচ্ছন্ন বিষাক্ত বাতাস আছে। আছে দুঃসহ যানজট। পঁয়ত্রিশ অথবা চল্লিশ ডিগ্রী তাপমাত্রায় অনির্দিষ্ট সময়ের এই সুনির্দিষ্ট যানজটে কি অবস্থা হতে পারে মানুষের? কি অবস্থা হতে পারে খুব জরুরী কোনো এ্যাপয়েন্টমেন্ট যদি থাকে ওই সময় কারো?

সম্পূর্ণ অসুস্থ অস্বাভাবিক ক্ষতিকর এই অবস্থায় এতোই অভ্যস্ত ঢাকাবাসী আর এতোই প্রতিক্রিয়াহীন তারা, ভাবা যায় না।

প্রায় প্রতিটি রাস্তায় নর্দমার পাশে আছে ধুলোয় গড়ানো নগ্ন শিশু। আছে চট অথবা পলিথিন দিয়ে তৈরি মানবেতর বস্তি। বস্তির শিশু বালক-বালিকারা বিশৃঙ্খলভাবে ছুটে চলা যানবাহনের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে বিক্রি করছে ফুল, এমন লোভনীয় দৃশ্যও আছে।

রাস্তার মাঝখানে করা আইল্যান্ডগুলোতে নগরের সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্যে লাগানো হয়েছে গাছ। অবহেলা অযত্ন

অনিয়ম খুব মনোরম করেনি গাছগুলোকে। হয়তো সে জন্যেই অথবা অপর্যাপ্ত ডাস্টবিনের কারণে, নাকি ডাস্টবিনে ময়লা ফেলার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি বলে বাড়ির নোংরা আবর্জনাগুলো নিঃসঙ্কোচে রেখে যাচ্ছে রাস্তার আইল্যান্ডে লাগানো গাছের নিচে নগরের আধুনিক আর সচেতন নাগরিকেরা।

হঠাৎ হঠাৎ নামছে প্রচণ্ড বৃষ্টি। গ্রীষ্ম, বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত, বর্ষায়। একই সাথে রাস্তার নিচের মলমূত্রের পাইপ ফেটে বেরিয়ে আসছে সব—আজ এ রাস্তায়, কাল ও রাস্তায়। কি হচ্ছে তারপর? বর্ণনা করবো সে ভাষা কোথায়? বৃষ্টিধারার সাথে নির্বিঘ্নে ছড়িয়ে পড়ছে উৎকট দুর্গন্ধময় ওই মলমূত্র এলাকাবাসীর আঙ্গিনায়। এখানে ওখানে সবখানে।

এসব পায়ে মাড়িয়ে বাচ্চারা যাচ্ছে স্কুলে সচেতন আর শিক্ষিত হতে। পায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে যে যার কাজে অতিব্যস্ত নাগরিকেরা সবাই। আবার ফিরছে বাড়িতে একইভাবে। এই জল-কাদায় যারা টানছে রিকশা, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, কি অবস্থা হচ্ছে তাদের কল্পনা করা যায়? এ রকম মানবেতর জীবনে অভ্যস্ত, দরিদ্রতম এসব মানুষের অবস্থা নিয়ে ভাববে কেউ, এমন সময় কার আছে ব্যস্ততম এই তিলোত্তমা নগরীতে?

গাড়ি মালিকেরা উদার অনেক এসব ব্যাপারে। সন্তানের মতো প্রিয় গাড়িটিকেও গ্যারেজে ফেলে রাখে না বিষিয়ে দেয়া বৃষ্টির বিষাক্ত সময়ে। গাড়ি থাকা এবং তা চালানোর সুখ নির্দ্বিধায় উপভোগ করে তারা তখনো রাস্তার ওই নোংরা জল দু'পাশে ছিটিয়ে।

এতে গাড়ি মালিকেরা যেমন কিছুই মনে করে না, পথচারীরাও মনে করে না কিছু। গাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই যাদের, যদি তারা ক্ষুব্ধও হয় বিষ্ঠাযুক্ত বিষাক্ত জলের ছিটায়, কি এসে যায় কার?

রাস্তাগুলোর ভেতর যেমন চলছে আধুনিক গাড়ি, পাশাপাশি তেমনি চলছে অনাধুনিক এবং প্রাগৈতিহাসিক সময়ের যানবাহন। উপভোগ কি করা যায় এই কন্ট্রাস্ট? নাকি ভাবতে হয় অবাক হয়ে, এ কোন্ দেশে আছি আমরা। উন্নয়নের এ কি অপূর্ব অভিনব জোয়ার এখানে।

'সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট'— কি অর্থে বলেছিলেন ডারউইন? আর কি অর্থে বাক্যটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে দুর্বৃত্ত পরিচালিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, তা জানে ক'জন এই পৃথিবীতে?

খুব সামান্য এ বর্ণনা থেকে কি ধারণা করা যাবে নগরীর প্রত্যন্ত অলিগলি আর পুরনো ঢাকার বীভৎস রাস্তাগুলোর অবস্থা?

দেশ, প্রিয় দেশ

না, যাবে না। চলাচলের অযোগ্য হলে তাকে রাস্তা বলা যায় কিভাবে? তবু তো রাস্তা বলছি। তবু তো চলছে মানুষ তার ওপর দিয়ে, না চলা গেলেও। জন্মের তেত্রিশ বছর পরেও অসম্ভব হয় যে দেশের রাজধানীর রাস্তাগুলোর বীভৎসতা এবং পঙ্গুত্ব বর্ণনা করা, সে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে যাঁরা বলেন, তাদের প্রশ্ন করতেই হয়, তেত্রিশ বছর বয়সী একটি দেশের উন্নয়ন বলতে তাঁরা কি বোঝেন? অথবা উন্নয়নের মৌলিক সংজ্ঞা কি?

একটি কথা মনে পড়লো। বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন আমাকে তাঁর লেখা যে ক'টি বই উপহার দিয়েছেন, 'প্রিয়জন' নামের বইটি প্রথমে পড়েছি আমি জার্মানিতে ফিরে এসে। পড়েছি অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে নিয়ে তাঁর লেখাটি, অন্য লেখাগুলোর আগে।

ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের অনেক দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও মতামতের সাথে আমার মিল ছিল না কখনো। তা না থাকতে পারে। সেজন্যেই তো প্রতিটি মানুষ ইনডিভিজুয়াল বা স্বতন্ত্র।

'প্রিয়জনে' অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাকের ওপর মামুন ভাইয়ের লেখাটি পড়তে গিয়ে বেশ ক'টি বিষয়ে একই ব্যাপার ঘটেছে। সব ক'টি নয়, কেবল একটি মতবিরোধ নিয়ে বলছি। মামুন ভাই একদিন বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে হতাশা প্রকাশ করায় রাজ্জাক স্যার ব্যাপারটাকে অন্যভাবে দেখতে বলেছিলেন।

বলেছিলেন, "দেখেন, আমি যখন ছাত্র, ঢাকা শহরে তখন ডাক্তার ছিলো একজন কি দুইজন, তাও এলএমএফ। বড়ো রাস্তাও একটি কি দু'টি। গাড়ি ছিলো না বা থাকলেও একটি দু'টি। সব বাদ দেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ছিলো ক'জন?"

স্যারের এই যুক্তিতে মামুন ভাই একমত হয়ে লিখেছেন, "সত্যিই তো, ব্যাপারটা সেভাবে দেখলে দেখা যাবে, দেশ এগিয়ে যাচ্ছেই। বেশ আশান্বিত হয়েছিলাম। নিজ বিভাগকেই এর উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারি। আমি যখন জয়েন করি বিভাগে তখন পিএইচডি ছিলো ২২ জনের মধ্যে পাঁচজনের। এখন ২৯ জনের মধ্যে প্রায় ২৫ জনের। পিছিয়েছে কীভাবে বলি?"

দেশের উন্নয়ন জাতীয় অধ্যাপক রাজ্জাক স্যার যেভাবে দেখতে বলেছিলেন, শুধুমাত্র এ রকম উন্নয়নের (?) জন্যেই কি স্বাধীন করা হয়েছিলো দেশটা? দেশটা স্বাধীন করার জন্যে কারা উৎসর্গ করেছিলো নিজেদের সবচেয়ে বেশি? কি হয়েছে তাদের? অন্ন বস্ত্র আশ্রয় শিক্ষা চিকিৎসা, এর কোনো একটির সর্বনিম্ন নিশ্চয়তা কি পেয়েছেন সেই সাধারণ যোদ্ধারা, যাঁরা করেছিলেন মুক্তির জন্যে অসাধারণ সব যুদ্ধ এবং কর্মকাণ্ড?

রাজ্জাক স্যার যখন ছাত্র ছিলেন, সেই ব্রিটিশ শাসন সময়ে জনসংখ্যা ছিলো কতো ঢাকা শহরে? কতো ছিলো সেই জনসংখ্যার মধ্যে শিক্ষিতের হার? ছাত্র ছিলো কতো? তখন কি ছিলো কম্পিউটারকেন্দ্রিক প্রযুক্তির সময়? ছিলো কি গাড়ি এবং অন্য সব প্রযুক্তিতে পৃথিবী আজকের মতো অবস্থায়, এবং এ রকম মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বজুড়ে? সে সময় কি সম্ভব ছিলো চাহিদা থাকলেই একটি দু'টি গাড়ি কিনে ফেলা? গাড়ি না থাকলে বড়ো রাস্তাইবা তৈরি হবে কি জন্যে? সে সময়ে কোনোভাবে একটা বাড়ি করা সম্ভব হলেও ব্যক্তিগতভাবে একটা গাড়ি কেনা ছিলো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার যে কোনো পর্যায়ের নাগরিকের জন্যে। ঢাকায় কারো গাড়ি না থাকলেও সেটা একেবারেই স্বাভাবিক ছিলো তখন। কিন্তু বাংলাদেশের মতো দরিদ্রতম একটি দেশে, যেখানে গাড়ি চলার মতো ভালো এবং পর্যাপ্ত রাস্তাই নেই এখন পর্যন্ত, যেখানে জল বাতাস পরিবেশ সব বিষাক্ত দেশের সরকার এবং জনসাধারণের অসচেতনতা এবং অনিচ্ছার কারণে, সে দেশে এখন যে পরিমাণ গাড়ি চলতে দেখা যায়, এটা কি স্বাভাবিক? এটাকে কোন যুক্তিতে বলা যাবে উন্নয়ন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন পিএইচডি কম থাকলেও সবদিক থেকে শিক্ষার যে পরিবেশ এবং মান ছিলো, এখন পিএইচডির পরিমাণ বাড়ার ফলেও শিক্ষক, শিক্ষার মান এবং পরিবেশ এতো নিচে নেমেছে কেনো? দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে এই পিএইচডিরা কি সবাই কোনো না কোনো ভূমিকা রেখেছেন? যদি রেখে থাকেন, তাহলে দেশটির এই অবস্থা কেনো? দেশ নাহয় বাদ দিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে কি করছেন এরা? যদি কিছু করে থাকেন, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ এবং শিক্ষার মান এতো নিচে নামলো কেনো? পিএইচডি এবং ডাক্তারদের পরিমাণ বাড়ায় দেশের উন্নয়ন এবং সম্মান কি বেড়েছে এখন?

রাজ্জাক স্যারের দৃঙ্গিভঙ্গিমতো উন্নয়নের ব্যাপারটাকে ওভাবে মেনে নিতে পারলে তো বলতেই হবে, উন্নত হয়ে গেছে বাংলাদেশ। আধুনিক বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা, এতো এতো এমবিবিএস ডাক্তার আর পিএইচডিতে যে দেশ পরিপূর্ণ, সে দেশকে অনুন্নত বলা কি দুঃসাহস নয়?

দেশ থেকে ফোন করেছিলেন এক বন্ধু আজ। একমাত্র ঢাকা শহরেই নাকি ষাটটির মতো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এখন, বললেন তিনি। এসব ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করে বের হয় বছরে কতো ছাত্র? তার ভেতরে চাকরি পায় কতো জন? এই ছাত্রদের পেছনে মা-বাবা খরচ করছেন কতো টাকা এবং কোথা থেকে পাচ্ছেন তাঁরা এই টাকা, জানতে ইচ্ছে করছে। বুঝতে ইচ্ছে করছে একাডেমিক ক্যারিয়ার না থেকে বেকার থাকা এবং একাডেমিক ক্যারিয়ার থেকে বেকার থাকার পার্থক্য। এসব ছাত্রছাত্রী কি লেখাপড়া করেন, নাকি লেখাপড়া কেনেন ওই সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে? এসব ইউনিভার্সিটির শিক্ষকরা কি শিক্ষাদান করেন, নাকি শিক্ষা বিক্রি করেন, প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে।

এসব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অসামান্য অবদানে দেশে শিক্ষিতের (?) হার অনেক বেড়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু কার কল্যাণ কতোটুকু হচ্ছে তাতে?

একজন জাতীয় অধ্যাপক যখন তাঁর প্রজ্ঞায়, অভিজ্ঞতায় দেশের উন্নয়নকে অন্যভাবে দেখতে বলেন আমাদের, তখন কি দেখি আমরা?

একটা প্রশ্ন করতে হয় তবুও, এঁরাই যদি বাংলাদেশের উনয়ন্নের প্রামাণ্যচিত্র হয়ে থাকেন, এই বাড়ি-গাড়ির মালিকেরা, এই ডাক্তার-পিএইচডিরা, এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা, তারাও কেনো এতো নিরাপত্তাহীন অসন্তুষ্ট অসুখী অতৃপ্ত জীবন কাটান বাংলাদেশে? কেনো দেশটার উন্নতি হয় না বলে আক্ষেপ করেন এতো?

কেনো এঁরাও, এঁদের প্রায় সবাই ভেসে যান গতানুগতিকতার প্রচলিত পথে?

চৌত্রিশ বছর বয়সী স্বাধীন (?) এই দেশটিতে এখনো কেনো জন্ম নেয়নি আত্মজিজ্ঞাসা, জবাবদিহিতার মতো জরুরী ব্যাপারগুলো? যদি আমরা এই প্রশ্নটি করি নিজেদের, দেশের একজন নাগরিক হিসেবে কি অবদান রেখেছি আমি দেশের যথার্থ উন্নয়নে? আমি তো কেবল আমার নিজের বা নিজের পরিবারেরই নই। আমি তো সমাজ-রাষ্ট্রেরও একজন। তাহলে কি করেছি আমি সমাজ-রাষ্ট্রের জন্যে এই জীবনে? কতোটা দায়িত্ববান, কতোটা সৎ, কতোটা সঠিক সচেতন হয়ে উঠেছি আমি এই দেশটির নাগরিক হিসেবে? যদি পারি পরিপূর্ণ সততায় এসব প্রশ্নের জবাব দিতে, কি হবে ফলাফল?

তাহলে ভাববো কি করে, কি করেইবা করবো প্রত্যাশা, উন্নত হবে দেশটি? কে করবে উন্নয়ন? কেবল সরকার? কি প্রমাণ করেছে তারা প্রায় তিন যুগ ধরে? তাদের ওপর তো বিশ্বাস, ভরসা কোনোটিই রাখতে পারছি না আমরা। কি হবে তাহলে?

এটা খুবই ঠিক, একটি দেশের উন্নয়নে সরকারের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কিন্তু দায়িত্ব আছে নাগরিকদেরও। সরকার পালন করছে না প্রমাণিতভাবে তাদের দায়িত্ব। নিশ্চয়ই তারা অনুভবও করছে না সেটা। অনুভব এবং পালন করছে না নাগরিকেরাও। কি করে উন্নত হবে দেশটি?

আমি নিজে সচেতন হয়ে উঠছি না, বুঝতেও পারছি না সচেতনতা ব্যাপারটি কি। আমি নিজে কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না, বুঝতেও পারছি না এতো দুর্দশাময় একটি দেশের জন্যে আমার দায়িত্ব কি। কিন্তু আমি চাচ্ছি দেশটি উন্নত হোক। কি করে হবে? নিজে কোনো রকম দায়িত্ব না নিয়ে ভাবতে পারি কি করে, সচেতন হবে অন্য একজন এবং দায়িত্বও নেবে সে। আমি কি সত্যিই দেশের কোনো উন্নয়ন চাই? নাকি চাই কেবল আমার অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সেটা যে কোনোভাবেই হোক? আর সে জন্যেই কি নিজেকে নিবেদিত করেছি না সবটুকু ?

এই যে দেশের কোনো উন্নতি হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করা, এ-ও কি কেবলই ভণ্ডামি নয়? এতে দেশের প্রতি অপ্রমাণিত ভালোবাসা দেখানো যায়। দায়িত্বও এড়ানো যায় সবটুকু। তারপরেও কি ভীষণ দেশপ্রেমিক মনে করছে সবাই, যখন দেখছে দায়দায়িত্বহীন এই আক্ষেপ কতো নিখুঁত। যদি কিছুটা সঠিকভাবে উপলব্ধি করি আমরা, যদি হতে পারি কিছুমাত্র সৎ, তাহলে আক্ষেপ না করে বলা উচিত আমাদের, দেশের যথার্থ উন্নয়ন হচ্ছে না, কারণ আমরা কোনো দায়িত্ব নিচ্ছি না। কিছু করছি না দেশের সঠিক উন্নয়নের জন্যে, কল্যাণের জন্যে। এমনকি এলাকায় একটি ডাস্টবিন থাকলে বাড়ির আবর্জনাগুলো ঠিকমতো তার ভেতরে ফেলার কাজটিও করছি না। পারছি না ডাস্টবিন না থাকলে এলাকাবাসী সম্মিলিত হয়ে যে কোনোভাবে দু'চারটি ডাস্টবিনের ব্যবস্থা করতে। ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার মতো খুবই জরুরী একটি অভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে জনগণকে সচেতন করে তুলতে। এটা কি সত্যিই কোনো কাজ একটি দেশের নাগরিকদের জন্যে, যাঁরা দেশটির কিছুমাত্রও উন্নয়ন চান?

বাংলাদেশের একটি বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র হচ্ছে আজিজ সুপার মার্কেট এবং পাশাপাশি আছে শাহবাগ মার্কেট। বাণিজ্য কেন্দ্র হলেও এই মার্কেট দুটোতে আছে অনেক প্রগতিশীল সংগঠনের কার্যালয়। আছে অনেক বইয়ের দোকান। বিভিন্ন জরুরী কাজে এবং আড্ডা দিতে এখানে আসেন দেশের নামকরা অনেক শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, চিন্তাবিদ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী। আসেন অনেক ছাত্রছাত্রী। আসেন প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর অনেক কর্মী। বিভিন্ন ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠানও হয় এখানে নিয়মিত। মানতে হবে, দেশ গড়ার অনেক কারিগর এবং তাঁদের মহৎ কর্মকাণ্ড এই মার্কেট দু'টিকে জড়িয়ে বিকশিত হচ্ছে। এসব কারণে এলাকাটি পেয়েছে ব্যতিক্রমী এক ইমেজ। বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শুদ্ধ চেতনা বিকাশের এ রকম একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠায় ভীষণ সুখী আমরা। ওখানে গেলে এক

জায়গাতেই দেখা হয়ে যেতে পারে অনেক প্রিয়জনের সাথে। হতে পারে অনির্ধারিত তাৎক্ষণিক আড্ডা। আড্ডায় চা থাকবে না কেবল, থাকতে পারে লুচি পরোটা মাংসের মতো ভারি খাবারও। এসবের ভেতর অবশ্যই জড়িয়ে থাকে উৎসাহ আন্তরিকতার নির্ভেজাল স্পর্শ।

সবই ঠিক আছে। কিন্তু কি অবস্থা ওই মার্কেট দু'টির ভেতরে এবং বাইরে, যেখানে আসে দেশের শিক্ষিত সংস্কৃতিবান প্রগতিশীল মানুষের বড়ো একটি অংশ?

কি চেহারা ওই প্রগতিশীল সংগঠনের কার্যালয়গুলোর? সুরুচি, সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতার কিছুমাত্র প্রমাণ নেই কোথাও এই মার্কেট দু'টির সামনে, পেছনে, ভেতরে।

নিঃসঙ্কোচে ছুড়ে ফেলা সব ধরনের পরিত্যক্ত জিনিস পড়ে আছে প্রতিটি অফিস এবং দোকানের সামনে নয় কেবল, এখানে ওখানে, ওপরে নিচে সিঁড়িতে, সব জায়গায়। ধুলোর এতোটুক অভাব নেই কোথাও। এতো নোংরা একটি মার্কেট, এতো চিৎকার চেঁচামেচি, আর দু'একটি ভয়াবহ দুর্গন্ধ দুর্যোগ আক্রান্ত যে টয়লেট সেখানে আছে, তাকে টয়লেট বললে লজ্জা পেতে হয়। অথচ এই মার্কেটের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন অনেক নারী। কারো অনুভূতি চিন্তাচেতনা দৃষ্টিকে বিন্দুমাত্রও আকর্ষণ করছে না অত্যন্ত জরুরী এবং জঘন্য এই বিষয়গুলো। মার্কেট কর্তৃপক্ষকে নয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নয়, দেশ গড়ার কারিগরদের নয়, ওখানে কর্মরত নারীদের নয়, ছাত্রছাত্রীদের নয়। প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত কর্মীদেরও নয়। রুচি পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার সাথে পরিচয় থাকলে কি সম্ভব দিনের অধিকাংশ সময় যে অফিসে বা দোকানে জীবন কাটাচ্ছে এতোগুলো মানুষ, সে জায়গাটির এমন অসহ্য অবস্থা তৈরি করা?

জন্মের পরে ওই বিল্ডিংটির শরীরে কখনো রং অথবা চুনকাম করা হয়েছিলো কিনা বোঝা যায় না। ভবিষ্যতে কখনো যে করা হবে না, সেটা নিশ্চিত হওয়া যায় বিল্ডিংটির শরীর এবং শরীরে ঝোলানো সাইনবোর্ডের সংখ্যাধিক্য থেকে। ভেতরের পরিচ্ছন্নতার কথা যাঁরা কল্পনাই করতে পারেন না, তাঁরা কি করে চিন্তা করবেন বাইরের সৌন্দর্য বাড়ানোর কথা, যেটা আরো অনেক বেশি খরচ এবং পরিশ্রমনির্ভর? তাঁরা কি করে ভাববেন এতো গুরত্বপূর্ণ, এতো ব্যস্ত এই মার্কেটে ঢোকার সময় রাস্তার পাশের যে উন্মুক্ত সরু নর্দমাটির ওপর দিয়ে লাফিয়ে যেতে হয়, তা নির্মূল করার কথা?

বিশ্বাস করা যায় না, এই নর্দমাটির পাশে আজিজ সুপার মার্কেটের গ্রাউন্ড ফ্লোরে চালু আছে বিভিন্ন রকম খাবারের দোকান। ভয়াবহ অপরিচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর এই খাবারের দোকানগুলোতে ক্রেতার ভিড় দেখলে এ দেশের প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা, এ দেশের নাগরিকেরা, ক্রেতা-বিক্রেতারা 'স্বাস্থ্য সচেতনতা' বলে যে দু'টি শব্দ আছে, তা কোনো দিন শুনেছেন বলে মনে হয় না। এই দোকানগুলোর সামনে ফুটপাথের ওপর যেভাবে খাবারগুলো তৈরি করা হয় তা দেখলে পেটের ভেতর থেকে হজম হয়ে যাওয়া সব খাবার বেরিয়ে আসতে চায় একসাথে।

প্রতিমুহূর্তে দেখা এসব দৃশ্য এতোই স্বাভাবিক বাংলাদেশের জনগণের কাছে, যা নিয়ে কেউ কথা বলছে এটাই হয়তো খুব অস্বাভাবিক মনে হবে তাদের।

এমন অনেক অনেক বিষয় নিয়ে তবুও বলতেই হবে কথা, যা অস্বাভাবিক মনে হবে না কেবল, মনে হবে ভয়ঙ্কর, অবিশ্বাস্য। মনে হবে, চৌত্রিশ বছর বয়সী প্রিয় দেশটি সত্যিই অনেক এগিয়েছে এবং এগোচ্ছে প্রতিদিন।

জার্মানি থেকে

ভাষা, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

হা সা ন হা ফি জ

বহুমাত্রিক তাঁর প্রতিভা ও অবদান। ভাষা, শিক্ষা, গবেষণা ও সাহিত্য, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তিনি নিজেই এক প্রতিষ্ঠান। এই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। ১৩ জুলাই তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর (১৮৮৫-১৯৬৯) জীবন আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ঘটনাপুঞ্জের বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁর চরিত্রেও আমরা লক্ষ্য করি নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ। সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, এই বৈপরীত্যের মধ্যেও রয়েছে অন্তর্নিহিত ঐক্য এবং সুষমা।

জ্ঞানতাপস শহীদুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হয়ে শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক একজন অব্রাহ্মণ বিদ্যার্থীকে কোনক্রমেই বেদের পাঠদানে সম্মত হননি। তিনি অগত্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপে তাঁর জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগে ভর্তি হন। ওই বিভাগে প্রথম ও একক ছাত্র ছিলেন তিনিই। আমরা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বহুভাষাবিদ হিসেবে জানি। কিন্তু ক'জন জানি যে, বহু ভাষা শেখার জন্য কী কঠোর পরিশ্রমই না তাঁকে করতে হয়েছে! সেই অসাধারণ শ্রম, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার কিছুটা পরিচয় মেলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহরই লেখা একটি চিঠিতে। প্যারিস থেকে এক পত্রে তিনি লিখছেন : "...আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাংলা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, পূরবিয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মারাঠী, সিন্ধী, লাহিন্দী, কাশ্মীরী, নেপালী, সিংহলী ও মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। বিরাট ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরাট কার্যের জন্য বিরাট আয়োজন চাই। তিব্বতীও শিখিতেছি। কাজেই বুঝিতে পার আমার সময়ের ওপর কিরূপ গুরুতর চাপ পড়িতেছে। কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অমনোযোগী নই।

প্রায় সাড়ে ১২টার সময় শুই এবং ৭টার সময় উঠি। ফজরের নামাজ পড়িয়া স্যান্ডোর Spring Dumb-bell লইয়া ব্যায়াম করি, ৪০টি বৈঠক ও ২০টি ডন করি। শুক্রবার প্যারিসের মসজিদে নামাজ পড়ি, নানা দেশের ৩০/৪০ জন মুসল্লী হইয়া থাকে। ইমাম সাহেব আলজিরিয়া নিবাসী, তাঁহার সহিত আরবীতে কিংবা পারসীতে (ফরাসী?) আলাপ করিয়া থাকি। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে Experimental Phonetics, বেদ, আবেস্তা ও Comparative Philologyr ক্লাসে যোগদান করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন College de France-এও গিয়া থাকি। আমার Thesis সম্বন্ধে Prof. Jules Block-এর সহিত কার্য করি।"

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ স্যার আশুতোষ মুখার্জির সহায়তায় ১৯১৩ সালে জার্মানিতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক ছাড়পত্র পাননি বলে সে সুযোগ তাঁর পক্ষে কাজে লাগানো সম্ভব হয়নি। ইতোমধ্যে তিনি আইন পড়েন এবং বিএল পাস করেন ১৯১৪ সালে। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পড়াশোনার জন্য তাঁর বিদেশ যাওয়া ছিল অত্যাবশ্যক। সুযোগ পেলেন অনেক পরে, সেটা ১৯২৬ সালের কথা। তিনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত। দু'বছরের ছুটি ও সাত হাজার টাকা ধার করে তিনি গেলেন প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার পি. জে. হার্টগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁদের উচ্চশিক্ষার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সে জন্য আর্থিক সহায়তারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তরুণ লেকচারার মুহম্মদ শহীদুল্লাহও।

তাঁর জন্ম ১৮৮৫ সালের ১০ জুলাই, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলায়। গ্রামের নাম পেয়ারা, এটি ছিল বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত। স্কুলজীবনেই ভাষা শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। স্কুলের মৌলবী সাহেবের মারপিটের ভয়ে ফারসীর বদলে সংস্কৃত নিয়েছিলেন। এন্ট্রান্স পাস করার পর ভর্তি হন কলকাতা মাদ্রাসায়, এফএ পড়ার জন্য। সে সময় কলকাতা মাদ্রাসা যুক্ত ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে। কলেজেও দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত পড়েছিলেন তিনি। এফএ পাস করার পর ভর্তি হলেন হুগলী মহসিন কলেজে, সংস্কৃত অনার্সসহ বিএ ক্লাসে। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হলে পড়াশোনা ব্যাহত হয়। পরে কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বিএ পাস করেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করেন ১৯১২ সালে।

পড়াশোনার পাঠ শেষ না হতেই যশোর জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক হিসেবে চাকরি করেছিলেন শহীদুল্লাহ। এমএ ও বিএল পাস করার পর যোগ দেন চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে, প্রধান শিক্ষক পদে। স্কুল শিক্ষকতা তৎকালে সুবিধাজনক পেশা ছিল না। ১৯১৫ সালে স্কুল মাস্টারি ছেড়ে তিনি নিজের জেলা বসিরহাটের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালতে ওকালতি শুরু করেন। পসারও মন্দ ছিল না। কিন্তু এই পেশার নৈতিক দিক তাঁর পছন্দ হয়নি। পরে যোগ দেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরৎ কুমার লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক পদে। ক্রমশ শহীদুল্লাহর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খবর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একই বছর তিনি সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগে প্রভাষক হিসেবে স্থায়ী চাকরিতে যোগ দেন। তাঁকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটর নিযুক্ত করা হয়। ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও নিযুক্তি লাভ করেন তিনি। ১৯৩৭ সালে সংস্কৃত ও বাংলা দু'টি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত হলে শহীদুল্লাহকে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয়। ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট হন ১৯৪০ সালে। ১৯৪৪ সালের ৩০ জুন তিনি বাংলা বিভাগ থেকে রিডার ও অধ্যক্ষ হিসেবে অবসর নেন। তার পরও তিনি যুক্ত ছিলেন শিক্ষকতায়, গড়ার কাজে। ১৯৪৪ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেয়া হয় তাঁকে। ১৯৪৮ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বাংলা বিভাগে সংখ্যাতিরিক্ত অধ্যাপক হিসেবে পুনর্নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৫২ সালে তিনি দ্বিতীয়বার অবসর নেন। তার পর দু'বছর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসী ভাষার খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ গড়ে তোলার জন্য আমন্ত্রিত হন তিনি। সেখানে তিন বছর অধ্যাপনা করেন। উর্দু ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক ছিলেন। বাংলা একাডেমীর অভিধান রচনা কার্যক্রমের প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন

১৯৬০ সালে। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান ও ইসলামী বিশ্বকোষের সম্পাদক হিসেবে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন বাংলা একাডেমীতে। সেখান থেকে অবসর নেন ১৯৬৭ সালের পয়লা এপ্রিল।

কিন্তু এত বড়মাপের পণ্ডিতের জীবনে কি অবসর বলে আদৌ কিছু থাকে? ঢাকার বিদ্বৎ-সমাজ তাঁকে অবসর দেয়ার ব্যাপারটি ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁকে ১৯৬৭ সালের শুরু থেকেই আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর এমেরিটাস' পদে বৃত করা হয়। প্রবন্ধ, ব্যাকরণ, স্কুলপাঠ্য, জীবনী, ধর্ম ও তত্ত্ব, সাহিত্যের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব ও লিপি সংস্কার, কবিতা, অনুবাদ, ছোটগল্প, শিশুসাহিত্য—বিচিত্র বিষয়ে তাঁর গ্রন্থ অনেক। সম্পাদিত গ্রন্থসংখ্যাও যথেষ্ট। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাসমূহের মধ্যে রয়েছে শিশু মাসিক আঙ্গুর, মাসিক আল ইসলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, কদণ ণেটডণ, বঙ্গভূমি, তকবীর ও কাজের কথা। ইসলাম প্রচার করা ছিল তাঁর মিশন। ১৯২৩ সালে তিনি 'মালাকান' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য গিয়েছিলেন রাজপুতনা। গঠন করেছিলেন আঞ্জুমান-ই-ইশা, আৎ-ই-ইসলাম নামের ইসলাম প্রচার সমিতি। ঢাকার কতিপয় অমুসলিমকে তিনি দীক্ষিত করেছিলেন ইসলাম ধর্মে।

মাতৃভাষা বাংলার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম দরদ ও মমতা। মাতৃভাষা বাংলাকে শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গন ছাড়াও রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে তিনি পালন করেন গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। 'আমাদের ভাষা সমস্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছেন, "...একদল অন্ধ সংস্কৃতভক্ত বাংলা ভাষার মধ্যে প্রচলিত আরবী-পারসী শব্দগুলিকে যাবনিক বলিয়া বর্জন করিতে চাহেন। আমি বলি আগে তাঁহারা বাংলাদেশ হইতে যবনকে দূর করুন, পরে ভাষা হইতে যাবনিক শব্দগুলি দূর করিবেন। যখন সংস্কৃত ভাষা হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র, দীনার প্রভৃতি গ্রীক শব্দ এবং ইকবাল, ইন্দবার, মুকাবিলা প্রভৃতি আরবী শব্দ গ্রহণ করিয়াছে তখন বাংলা ভাষার বেলায় আপত্তি কেন? এই সকল আরবী-পারসী শব্দ বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে। ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাড়ান সহজ ব্যাপার হইবে না। দোয়াত, কলম, কাগজ, জামা, কামিজ, কমর, বগল প্রভৃতি আইন-আদালতে প্রচলিত সর্বসাধারণের সহজবোধ্য হাজারখানিক শব্দ ত্যাগ করিয়া নতুন শব্দ গড়িলে তাহা নামের জোরে পুস্তকে চলিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ভাষায় চলিবে না। বাংলা ভাষায় আরবী, পারসী, তুরকী, ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি যে কোন ভাষার শব্দ বেমালুম খাপ খাইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজেদের দখলী স্বত্ববলে বাংলা ভাষার থাকিবে। তাহাদিগকে তাড়াইতে গেলে জুলুম করা হইবে।" এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ সনের ১৯ মাঘ।

তথ্যসূত্র : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ॥ মনসুর মুসা ॥ বাংলা একাডেমী ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩

বাঙলা ভাষা ॥ মনসুর মুসা সম্পাদিত ॥ খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং ॥ ফাল্গুন ১৩৭৭।

ভার্জিন

উম্মে মুসলিমা

ঘটনাটি ঘটার পর ছন্দিতার মনে পাপপুণ্যের সংজ্ঞা একেকবার একেকভাবে বিশ্লেষিত হতো। সামান্য জ্বর হলেও ও ভাবতো এটা বোধহয় আল্লাহর শাস্তি। ও শুনেছিল পাপীরা যে মৃত্যুর পরই শুধু দোজখে পুড়বে তা-ই নয়, পৃথিবীতেও তাদের জন্য বার বার শাস্তি নেমে আসবে। তাই বোধহয় গরম পানির হাঁড়ি উল্টে ওর পা ওভাবে পুড়ে গিয়েছিল। এসএসসিতে অল্প কয়েক মার্কের জন্যে সে সেকেন্ড ডিভিশন পেল না। তার অতি আদরের বেড়াল ববিকে একদিন সন্ধ্যার পর বাগানে মরে পড়ে থাকতে দেখলো। কিন্তু ওর তো আসলে কোন দোষ ছিল না। রাশেদ চাচু ওভাবে হুট করে দরজা বন্ধ করে দেবে জানলে কি তখন ওনাকে ও চা দিতে যায়।

বাবার কলিগের স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীতে মিলাদ মাহফিলে যোগ দিতে ছোট ভাইকে নিয়ে বাবা-মা বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গিয়েছিল—

'তোর রাশেদ চাচুকে সন্ধ্যের সময় চা নাস্তা দিস। আমরা শিগগিরি ফিরবো।

রাশেদ চাচু আসলে ওর বাবার কোন ভাই ব্রাদার নয়। বাবার যখন পাবনাতে পোস্টিং হলো তখন ওরা প্রথম যে বাসাটিতে ভাড়া থাকতো, সেটার বাড়িয়ালা ছিল বাছেদ চাচু। আলহাজ বাছেদ খন্দকার। রাশেদ চাচু ছিল ঐ বাছেদ চাচুর মেজ ভাই। সে তখন ঢাকায় ভালো ব্যবসা করতো। স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে মোহাম্মদপুরে তাজমহল রোডে বিহারীদের ফেলে যাওয়া চার তলা বিল্ডিং দখল করে সে দিব্যি রাজার হালে থাকতো। মাসে অন্তত একবার ব্যবসার কাজে পাবনায় গিয়ে বড় ভাইয়ের বাসায় দু'তিনদিন করে থেকে আসতো। ছন্দিতার বাবা-মায়ের সঙ্গেও খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। দারুণ জমাতে পারতো নাকি। পাবনায় ছন্দিতার বয়স তখন সাত কি আট। তারপর পাবনা থেকে ওর বাবা সেই কবে বদলি হয়ে যশোর চলে গেল, যশোর থেকে কুষ্টিয়া। দু'একবার অল্প সময়ের জন্যে দেখা রাশেদ চাচুকে ছন্দিতার একটুও মনে ছিল না। তারও দীর্ঘ প্রায় আট বছর পর ছন্দিতার যখন সামনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা তখন একদিন দুপুরের দিকে খয়েরি রঙের গগলস পরে দেখতে অনেকটা রজার মুরের মতো নাকের পাশে কালো তিল নিয়ে দীর্ঘদেহী সুদর্শন একটু মোটা ধাচের এক ভদ্রলোক তাদের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো— সিদ্দিক সাহেব বাসায় আছেন? বলে গগলস খুলতেই মা হৈহৈ করে উঠলো—

আরে রাশেদ ভাই যে, চিনবো কি করে? কবে কবে এত মোটা হলেন? বাবা নাকি রাশেদ চাচুর মতো এমন তাসবোদ্ধা আর কাউকে পায়নি এ যাবতকাল। তাসের পিঠে তাস ফেলতেই তো আর খেলা হয় না। হিসাব আর কৌশলটাই বড়। রাশেদ চাচুকে দেখে বাবার চোখ অনেকদিন বাদে চকচক করে উঠলো। প্রবল আপত্তি তুলে বাবা প্রায় নাছোড়বান্দার মতো বললো—

"না না রাশেদ হোটেল ফোটেলে তোমার থাকা টাকা হচ্ছে না। যে তিনদিন আছ এখানেই চারটে ডালভাত খেয়ে সাহেব বিবি পিটাই এসো।" রাশেদ চাচু ব্যবসার কাজে কুষ্টিয়া এসে ছন্দিতার বাবা-মার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাত করতে এলে বাবা তাকে আটকে দিল। রাশেদ চাচু যখন দোনামনা করছিল তখন বাবার ডাকে ছন্দিতা দরজায় এসে দাঁড়াতেই তার চোখ বিস্ময়ে যেন স্থির হয়ে গেল। জাপানী পুতুলের মতো তুলতুলে মেয়েটি যেন এই মাত্র লাবণ্যের ঝর্ণায় স্নাত হয়ে পবিত্রতার প্রতিমূর্তিরূপে আবির্ভূত হলো।

'আরে এতবড় হলে কবে তুমি? কি পড়ছো? কী আশ্চর্য, আমাকে চিনতে পারছো?' —চোখ না সরিয়ে রাশেদ চাচু উত্তরের অপেক্ষায় প্রায় হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'এবার ম্যাট্রিক দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছিস কেন, চাচুকে সালাম কর' —বলে ওর মা চা নাস্তার জন্যে দ্রুত বেরিয়ে গেল। ছন্দিতা সালাম করে পাশে দাঁড়াতেই রাশেদ চাচু যেন অনাঘ্রাতা পুজোর পুষ্পের গন্ধ পেল। ইচ্ছে হচ্ছিল লবঙ্গ লতিকার মতো হাতটা ধরে পাশে বসাতে। ছন্দিতা সালাম সেরে উঠে দাঁড়াতেই রাশেদ চাচুর গা থেকে যে গন্ধ আর তার সঙ্গে একটা গরম নিঃশ্বাস পেল তাতে ওখানে উনার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর খুব অস্বস্তি লাগছিল। উনার ঘন নিঃশ্বাসে ছন্দিতার অপাপবিদ্ধ কিশোরী শরীর সংস্কারের বাতাবরণে একটু একটু করে সংকুচিত করছিল নিজকে। ওখানে আর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল না। ছন্দিতা সামনেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার অজুহাতে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলো। বাবা মঞ্জু মামা আর সাধন কাকাকে খবর দিয়ে সে রাতে রাশেদ চাচুর সম্মানে ভালো খাওয়ার ব্যবস্থাসহ সারারাত তাসখেলার তোড়জোড় করতে লাগলো। ছন্দিতাও অনেক রাত অবধি পড়াশোনা করে। পাশের ঘর থেকে বাবার আর সাধন কাকার গলাই বেশি ভেসে আসছিল। বাবা রাশেদ চাচুকে পেয়ে খুব উল্লসিত। ওদের দেখিয়ে দেয়া যে দেখ, খেলোয়াড় কাকে বলে। রাশেদ চাচু ঐ রাতে দু'বার টয়লেটে যাওয়ার পথে ছন্দিতার পড়ার টেবিল ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছিল। 'ভালো করে পড়াশোনা করো' বলে সেই একই রকম ঘন আর গরম নিঃশ্বাস ফেলে খসখসে গলায় ছন্দিতাকে আদরের ছলে ঘাড়ে হাত দিয়ে নিজের দিকে একটু টেনে নিয়েছিল। বাবাও তাকে আদর করে। কিন্তু কই এ রকম তো লাগে না। রাশেদ চাচুও তো বাবারই মতো। কিন্তু পরদিনই ঘটনাটি ঘটে গেল।

তারপর দীর্ঘদিন ছন্দিতার কিশোরী মনে পাপবোধের অন্ধ বাদুড় ডানা ঝাঁপটাতো। নিজেকে পাপী ভেবে ওর মাঝেমধ্যেই বিদ্রোহী হয়ে উঠতে ইচ্ছে হতো। মনে হতো এ কালিমাময় জীবনে কোন ভালো কাজের যোগ্য সে নয়। কিন্তু ওর তো আসলে কোন দোষ ছিল না। ও তো স্বপ্নেও ভাবেনি ওমনটি ঘটবে। ওটা নিশ্চয়ই একটা দুর্ঘটনা। ওর কোন পাপ নেই।

একদিন কলেজ থেকে ফিরে বাবা-মায়ের মুখ থমথমে দেখে থমকে গিয়েছিল ছন্দিতা। ওর বুকের ভিতর ঐ সন্ধ্যের ঘটনাটি ক্রমশ ফিকে হয়ে আসলেও ভয়টা তখনও কাটেনি। শুধু মনে হতো বাবা-মা যদি কখনও জানতে পারে তাহলে ওর অবস্থা কী হবে আর এত পছন্দের রাশেদ চাচুর অবস্থানটা কোথায় দাঁড়াবে। তবে সেই চলে যাওয়ার পর থেকে গত চার পাঁচ বছরে যেহেতু রাশেদ চাচার কোন খবর আর পাওয়া যায়নি সেহেতু ছন্দিতা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল ঘটনাটির জন্য রাশেদ চাচারও লজ্জার সীমা ছিল না। তবু বাবা অথবা মা যদি তাকে কখনও ছন্দ এদিকে একটু শুনে যা তো বলে ডাকত ছন্দিতা আসতাগফেরুল্লাহ পড়ে বুকে ফুঁ দিয়ে গিয়ে হাজির হতো। সেদিনও বাসায় ফিরে দুরুদুরু বুকে তার চোখে কী হয়েছে জিজ্ঞাসা নিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াতেই মা চোখের কোণ আঁচলের খুটে মুছে বলল—

'ঐ যে বছর চার পাঁচ আগে রাশেদ নামে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, রাতে তোর বাবার সাথে সারারাত তাস খেলেছিলেন, আরও দু'দিন থাকার কথা থাকলেও পরদিন সন্ধ্যের পরই হঠাৎ করে চলে গিয়েছিলেন— তোর সেই রাশেদ চাচু স্ট্রোক করে গত সপ্তাহে মারা গেছেন।' ছন্দিতার কাছে সেই মুহূর্তে সারা প্রকৃতি ছন্দোময় হয়ে উঠলো। ওর নিশ্চল শরীর যেন 'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'-এর মতো ঘনীভূত হয়ে উঠতে লাগলো। পৃথিবীতে নিজেকে সবচে সুখী মনে হলো। কৃত্রিমভাবে আহা আহা করতে করতে সে নিজের ঘরে গিয়ে আনন্দে বিছানায় গড়িয়ে পড়লো। সে নিজে ছাড়া আর কেউ তার জীবনের ঐ গোপন সন্ধের সাক্ষী থাকলো না।

নিয়তির নির্মম পরিহাসের মতোই বাছেদ চাচু অর্থাৎ পাবনার বাড়িওয়ালা চাচু যেদিন স্বয়ং ঘটক হয়ে তার মরহুম মেজভাই রাশেদের সুযোগ্য পুত্র লিবিয়া নিবাসী পারভেজ সামিরের সঙ্গে ছন্দিতার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলো সেদিন লুপ্তপ্রায় পাপবোধ আবার ছন্দিতাকে অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরলো। এ কি করে সম্ভব? এক পাপের উপর আরেক পাপ? কিন্তু এ রকম লোভনীয় প্রস্তাব কেন ছন্দিতার

বাবা-মা তাদের লেখাপড়ায় গড়মানের ছাত্রী সুন্দরী মেয়ের জন্যে ফিরিয়ে দেবেন। 'আমি মাস্টার্স শেষ করি তার পর না হয় ভাবা যাবে' বলে পাশ কাটাতে গেলেও সবাই 'ও একটা কথার কথা' মনে করে বাছেদ চাচুকে ফাইনাল কথা দিয়ে দিল। ছন্দিতা বিয়ের আগের ক'দিন কেবল নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করেছে। শেষমেশ এই বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে– 'ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।' আমার তো কোন দোষ ছিল না। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করিনি। আমি কারো সঙ্গে প্রতারণা করিনি। আমি নিষ্পাপ।" তা না হলে রাশেদ চাচু ওভাবে হুট করে দরজা বন্ধ করে দেবে জানলে কি তখন ওনাকে ও চা দিতে যায়? বাবা-মা বেরিয়ে গেলে সেই সন্ধ্যায় ছন্দিতা চা হাতে রাশেদ চাচুর ঘরে ঢুকে ঘর অন্ধকার দেখে লাইট জ্বালাতে গেলে রাশেদ চাচু না থাক, তুমি কাছে এসে বসো, বলে ওকে প্রায় পাঁজাকোলা করে বিছানায় নিয়ে আসে। ছন্দিতা হকচকিয়ে ওর হাতের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসতে চাইলে সে ছন্দিতার মুখটা বাঁ হাত দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ডান হাতে দরজার হুড়কো লাগিয়ে দেয়। ছন্দিতা আবার সেই গন্ধ পায়। ওর সারা শরীর প্রতিরোধে শক্ত হয়ে ওঠে। রাশেদ চাচু তার সবল এক হাত দিয়ে ছন্দিতার দু'হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে অন্য হাতে তার সালোয়ারের বন্ধ একটানে ছিঁড়ে ফেলে। মিনিট পাঁচেক পর ছন্দিতা যখন তার সালোয়ারে জবা ফুলের মতো ছোপ ছোপ রং দেখে কেঁদে কেঁদে সারা তখন রাশেদ চাচু বার বার নরম তোয়ালে দিয়ে ওর চোখ মুছিয়ে দিচ্ছিল আর বলছিল– 'কাঁদে না সোনামণি। আমাকে ক্ষমা করে দিও। এ কথা কাউকে বলো না। বাথরুমে যাও। আমি আর কোনদিন তোমাদের বাসায় আসবো না। চোখ মোছ। স্বাভাবিক হও। বাবা-মা যেন কিছু টের না পান।'

মিলাদ থেকে ফিরে বাবা-মা দেখতে পেল আরও দু'দিন থাকার কথা থাকলেও রাশেদ চাচু তার ব্যাগ গুছিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত। ঢাকা থেকে টেলিফোনে জরুরী তলব পেয়ে তাকে তখনই রওনা দিতে হচ্ছে। কুষ্টিয়ায় কাজ থাকলে এখানেই উঠবে সেই শর্তে রাশেদ চাচু সেদিনকার মতো তড়িঘড়ি বিদেয় হলো। তারপর দীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর পর একেবারে মৃত্যুর সংবাদ।

লিবিয়া নিবাসী বর লিবিয়ার জোব্বামার্কা বিয়ের পোশাক পরে, থুঁতনিতে এক চামচ দাড়ি নিয়ে সুন্দরী বউ পেয়ে দামী গাড়ি হাঁকিয়ে নিজের বাড়ি চলে গেল। ছন্দিতা শাহ্নজরে অবিকল যে মুখটা দেখতে পাবে বলে অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছিল তার সাথে বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পেল না। বাবার কিছুই পায়নি ছেলেটা। না সে রকম উচ্চতা, না রং না স্বাস্থ্য। ছন্দিতা এক ধরনের স্বস্তিই পেল। শ্বশুরবাড়ির বিশাল ড্রইংরুমে প্রবেশ করেই ছন্দিতা বুকের ধুকপুকানি কমাবার চেষ্টা করলো।

অনেক মূল্যবান আসবাব আর বিদেশী জিনিসপত্রে বাসরঘর ঠাসা। কেবল রুচি ছাড়া ঐ কক্ষে আর কোনকিছুরই অভাব ছিল না। বাছেদ চাচুর দুই মেয়েও তাদের স্বামী সন্তানসহ লিবিয়ায় থাকে। ওরা বিয়ে উপলক্ষে সবাই হাজির। বাছেদ চাচুর দুই মেয়ের জামাই সম্পর্কে ছন্দিতার ননদাই দু'জন এমন নোংরা কৌতুক বলতে শুরু করলো যে, ছন্দিতার ঘেন্নায় গা রি রি করে উঠলো। স্বামীটা তার যে বিয়ের আগেই ভাজা মাছটি উল্টে খেতে শিখেছে এমন ধারণা দিতেও তারা কসুর করলো না। শেষমেশ শালার হাতে ধবধবে সাদা রুমাল গুজে দিয়ে দুলাভাইদ্বয় অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বিদেয় হলো।

খুব ভোরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে ছন্দিতা স্বামীকে বিছানায় না দেখে জানালায় চোখ পড়তেই বারান্দায় স্বামীকে তার দুই দুলাভাইয়ের সঙ্গে শলাপরামর্শে রত দেখে ঝটতি আড়ালে সরে এলো। স্বামীর হাতে রাতের সেই ধবধবে সাদা রুমালটি। দুই দুলাভাই পারলে মাইক্রোসকোপ দিয়ে রুমালটিতে কী যেন খুঁজে পেতে চাচ্ছে। ছন্দিতা রাতে ভালো করে লক্ষ্য করেনি কিন্তু ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের দক্ষিণের দেয়ালে প্রয়াত শ্বশুর সাহেবের রজার মুর মার্কা ফটোগ্রাফে চোখ পড়ায় তার বুকটা অজানা আশঙ্কায় দুলে উঠলো।

প্রাচুর্যের দেশে ক'দিন

ড. দীপক কান্তি দাশ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আমি বিলেতে প্রায় চার বছর ছিলাম। বহু ভদ্র অতিভদ্র ইংরেজের দেখা পেয়েছি কিন্তু সাধারণভাবে ইংরেজদের একটু রেসিস্ট (টিউটর্ধ্ব) বলে মনে হয়েছে। সে তুলনায় আমেরিকানদের, বিশেষ করে শ্বেতকায়দের আমার কাছে অনেক বেশি ভদ্র মনে হয়েছে। একবারের জন্যও মনে হয়নি এঁরা বর্ণবিদ্বেষী। বিকাল হয়ে এসেছে, ক্লান্ত বোধ করছি। অসীমের বাসায় ফিরার আগে ভাবলাম লিঙ্কন মেমোরিয়াল দেখে যাব। ম্যাপ দেখে পথ চললাম। দৃশ্যপট জেফারসন মেমোরিয়ালের একেবারে বিপরীত। প্রচুর দর্শক। সিঁড়ি বেয়ে অনেক উঁচুতে মেমোরিয়ালের চত্বর। সেখানে চেয়ারে উপবিষ্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের অতিকায় শ্বেতপাথরের মূর্তি। অবশ্য পুরো মেমোরিয়ালই শ্বেতপাথরের। সামনে সরু লম্বা কৃত্রিম জলাধার। জলাধারের অপর প্রান্তে বহুদূরে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট পরিদৃশ্যমান। পুরো দৃশ্যটাই নয়নাভিরাম এবং দর্শক মনোরঞ্জনের নিমিত্তে সুপরিকল্পিত।

হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতো তাদের নতুন জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য অসীম দম্পতির কাছে ক্ষমা চেয়ে এবং আতিথেয়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা পরের দিন রওনা হলাম নিউইয়র্কের উদ্দেশে। মাঝপথে নিউজার্সিতে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রাবিরতি করলাম, আমার এক ভাগ্নি স্বামী-কন্যাসহ ক'মাস আগে ডিভিতে আমেরিকা গেছে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য। নিউইয়র্কে আমরা সুকমলের বন্ধু এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র জীবনানন্দ বিশ্বাসের বাসাতেই উঠি। আমরা যখন জীবনের বাসাতে পৌঁছাই তখন রাত হয়ে গেছে। আমাদের আতিথেয়তা প্রদানের জন্য জীবন দু'দিনের ছুটি নিয়েছে। আমরা একটু ফ্রেশআপ হয়ে নিলাম। একটু চা খেয়ে নিলাম। আবহাওয়া চমৎকার। জীবন প্রস্তাব করল, আমরা ম্যানহাটন (Manhatton) ড্রাইভে যাব এবং ফিরে ডিনার সেরে নেব। সারথীর কাজ নিল জীবন নিজে। জীবনের বাসা কুইন্সে (Queens)।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটি প্রধানত ম্যানহাটন, কুইন্স ও ব্রুকলিন–এ তিনটি প্রায়উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত। এত বড় বিশাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে জনবহুল এবং সম্ভবত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শহরটি কেন যে আটলান্টিকের উপকূলে গড়ে উঠল আমার বোধগম্য হলো না, মেইনল্যান্ডে কি জায়গা হলো না! অবশ্য নিউইয়র্ক যেখানে তাতে নিউইয়র্কের কোন সৌন্দর্যহানি হয়েছে, তা বলব না। এই তিনটি উপদ্বীপ বহুসংখ্যক সেতু বা টানেল দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং এগুলোর মধ্যে যাতায়াত এত সহজ যে মনেই হয় না সমুদ্র জলরাশি এই তিনটি অংশকে প্রায় আলাদা করে রেখেছে। আমরা প্রথমে গেলাম মেডিসন স্কয়ারে, যেখানে ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে এবং মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থসংগ্রহের জন্য জগদ্বিখ্যাত সেতারবাদক রবিশঙ্কর এবং প্রখ্যাত বিটলস্ সদস্য জর্জ হ্যারিসনের যুগলবন্দী অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অন্য সব অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক দিকটির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে টাইমস্কয়ারে যাওয়ার পথে জীবনকে বললাম, আমি কিন্তু এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (Empire State Building) না দেখে নিউইয়র্ক ছাড়ছি না। সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম এই প্রাসাদটিকে আমি ভাল করে দেখতে চাই। আমেরিকার রাস্তায় গাড়ি চলে 'রাইটহ্যান্ড ড্রাইভ' অর্থাৎ রাস্তার ডান দিকে, আমাদের দেশে চলে রাস্তার বাম দিকে। একটু পরই জীবন আমাকে বলল, স্যার, একটু আপনার ডান দিকে তাকিয়ে থাকুন। গাড়ি চলছিল আস্তে আস্তে। রাস্তা আলো ঝলমল। ফুটপাথের ধারে এক জায়গায় ছোট্ট করে লেখা 'এম্পায়ার এ্যাভিনিউ'। বললাম, ঐখানেই কি সেই অন্যতম সপ্তম! 'একটু সামনেই, কাল আসব, তখন ভাল করে দেখে নেবেন'। আমি বললাম, এলাম যখন যতটুকু সম্ভব দেখি, গাড়ি থামাও। নেমে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের উচ্চতা দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু রাস্তার দু'পাশে এত বেশি সুউচ্চ ভবন রয়েছে যে আলাদা করে এই বিশেষ ভবন দেখা সম্ভব হলো না। অতৃপ্ত মনে গাড়িতে ফিরে এলাম। টাইমস্কয়ারে এলাম। দিনের আলোর মতো চারপাশ আলোকিত। প্রচুর লোকসমাগম। সব সময়ই নাকি এখানে জনাকীর্ণ থাকে। কয়েক জায়গায় সারাক্ষণ খোলা পর্দায় সিনেমা বা ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। এখানে মনে হয় রাত হয় না। নিউইয়র্কের রাস্তা, বিশেষ করে ডাউনটাউনে, অন্য শহরের তুলনায় কম মসৃণ। রাস্তা দিয়ে ভীষণ গতিতে হলুদ ক্যাবগুলো চলে বুক কাঁপানো হর্ন বাজিয়ে। আমেরিকা বা পশ্চিমা বিশ্বের কোন শহরে সাধারণত গাড়ির হর্ন শোনা যায় না। নিউইয়র্ক একমাত্র ব্যতিক্রম। আরও জানলাম, এই ক্যাবচালকদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশী। অনেক রাতে যখন জীবনের বাসায় কুইন্সের দিকে ফিরছি, পিছন ফিরে দেখি সালোক এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং সগৌরবে সবাইকে ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বস্তুত নিউইয়র্কের সরকারী-আধাসরকারী সকল ভবন সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত আলোকিত থাকে। নগরীকে প্রাণচঞ্চল ও দৃষ্টিনন্দন রাখা হয়। নিউইয়র্কে, বিশেষ করে ম্যানহাটনে রয়েছে অগুনতি সুউচ্চ ভবন। এসব ভবনের রঙিন আলো রাতের নিউইয়র্ককে নয়নাভিরাম করে তোলে। পশ্চিম দিকে হাডসন নদী, পূর্বদিকে ইস্টরিভার ম্যানহাটনকে নিউইয়র্কের মধ্যেই আলাদা করে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে রেখেছে।

পরের দিন জীবন আমাদের প্রথমে নিয়ে গেল নিউইয়র্কের বিখ্যাত এ্যাকুরিয়ামে। ডলফিনের খেলা দেখানো হলো, সাদা তিমিও দেখলাম। ন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখতে গেলে সারাদিন লেগে যাবে। তাই সে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে মিউজিয়ামের অংশ আমেরিকান মিউজিয়াম অব ন্যাচারালহিস্ট্রি দেখতে গেলাম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছায়াপথ, সৌরজগতের ত্রিমাত্রিক ডকুমেন্টারি দেখলাম। জীবন বলল, এবার চলুন স্যার, দিনের আলোতে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখবেন। কুইন্স থেকে ম্যানহাটনে যাবার পথে দূর থেকে সেই সুউচ্চ সৌধ থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। যা হোক, ম্যানহাটনের ফিফথ এ্যাভিনিউর থার্টিফোর্থ স্ট্রীটে আমরা নামলাম যেখানে এম্পায়ার এ স্টেট বিল্ডিং। দিনের আলোতেও রাস্তায় দাঁড়িয়ে এ ভবনকে ঠিকমতো অবলোকন করা যায় না। দূর থেকে তার যে সৌন্দর্য বা আলাদা সত্তা কাছে থেকে তা বোঝা যায় না। জীবন গাড়ি পাহারায় রইল, আমরা ভবনের ভিতর ঢুকলাম। ঢুকে দেখলাম, এই ভবন দেখার জন্য আদিখ্যেতা বা বোকামি শুধু আমি একা করছি না, আমার মতো আরও বহু বোকা, সাদা-কালো-বাদামী নারী-পুরুষ, বাচ্চা ভিড় জমিয়েছে এই

এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং দেখার জন্য। বিল্ডিংয়ের গ্রাউন্ড ফ্লোরে কয়েকটা স্যুভেনিরের দোকান, তার নিচের (আন্ডারগ্রাউন্ড) ফ্লোরে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে। বিল্ডিংয়ের উপরে উঠতে হলে দশ ডলার দিয়ে টিকিট কিনতে হয়। যথারীতি টিকিট কেটে এস্কেলেটরে তিনতলায় উঠলাম। তিনতলায় অনেক লিফ্‌ট। অনেক দ্রুতগতির এই লিফটগুলো মিনিটে ১৪০০ ফুট ওঠানামা করে। আমাদের দেশে যে লিফট ব্যবহার করা হয় সেগুলো সাধারণত প্রতিমিনিটে ৪০০/৫০০ ফুট গতির হয়ে থাকে। কয়েক সেকেন্ডে আমরা বাইশ তলাতে উঠলাম। লিফট বদল করে প্রায় একলাফেই আমরা ছিয়াশি তলায় উঠলাম। দর্শকের জন্য এখানে প্রশস্ত ব্যালকনি রয়েছে। আমরা এখন ভূমি থেকে ১০৫০ ফুট উপরে। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং এক শ' ছয় তলাবিশিষ্ট, মোট উচ্চতা ১২৫০ ফুট। কিন্তু দর্শকদের জন্য ছিয়াশি তলা পর্যন্ত। আরও বিশটি তলা দর্শকদের জন্য নয়। এখানে দাঁড়িয়ে এক শিহরণ জাগানো দৃষ্টি দিয়ে সমস্ত নিউইয়র্ককে যেন দেখা যায়। এখানে দাঁড়িয়ে নিউইয়র্কের অন্য সুউচ্চ ভবনগুলোকেও ছোট মনে হচ্ছিল। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। কথিত আছে, এই ভবনের উচ্চতম অংশ প্রায় আশি মাইল দূর থেকে দেখা যায়। ১৯৩০ সালে এই ভবন নির্মাণ শুরু হয়। স্থপতি ছিলেন উইলিয়াম ল্যাম্ব। সপ্তাহে সাতদিন কাজ করে প্রায় চার হাজার লোক মাত্র সাড়ে তেরো মাসে এই নির্মাণ কাজ শেষ করে। প্রায় আট বিঘা জমির ওপর এই ভবন নির্মিত। মূলত ইটের তৈরি হলেও ভবনের বহিরাংশ গ্রানাইট পাথরে আচ্ছাদিত। এর আগে নিউইয়র্ক তথা বিশ্বের উচ্চতম ভবন ছিল ষাট তলাবিশিষ্ট। ১৯৩১ সালের ১ মে এই ভবন জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পর থেকে মধ্যসত্তর পর্যন্ত এই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংই ছিল দুনিয়ার উচ্চতম ভবন এবং মনুষ্যসৃষ্ট সপ্তম আশ্চর্যের একটি। মধ্যসত্তরে শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ার (Sears Tower) নির্মিত হলে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং হয়ে যায় দ্বিতীয় উচ্চতম ভবন। উল্লেখ্য, সিয়ার্স টাওয়ারের স্থপতি ছিলেন বাংলাদেশের কৃতী সন্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা পুরকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খান। আরও পরে ম্যানহাটনে নির্মিত হয় সম্প্রতি ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইনটাওয়ার, যা ছিল সিয়ার্স টাওয়ারের চাইতেও উচ্চ। তবে এই মুহূর্তে পৃথিবীর উচ্চতম ভবন হবার গৌরব রয়েছে মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস টুইনটাওয়ারের। ছোটবেলা থেকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং সম্বন্ধে এত শুনেছি যে, ইচ্ছা ছিল কোন সময় আমেরিকা যাওয়ার সুযোগ হলে এই আশ্চর্য ভবন অবশ্যই দর্শন করব। সে আশা পূরণ হলো। শুধু সাধারণ চোখে একটি ভবন দেখা নয়, এর প্রকৌশল স্থাপত্যের দিকটিও দেখার বিষয়, আমার কাছে তো বটেই। জুন মাসের শেষদিক বিধায় আবহাওয়াও বেশ সুন্দর, ফুরফুরে, নাতিশীতোষ্ণ। ম্যানহাটনের পূর্ব প্রান্তে ইস্টরিভারের তীরে জাতিসংঘ সদর দফতর। অন্য অনেক দেশের সাথে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা পতপত করে তার সগৌরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে দেখে বুক ভরে গেল। ইতস্তত এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ গাড়িতে ঘুরে মনে হলো কিছু খাওয়া দরকার। একটা চত্বর। বহু ভ্রমণার্থী, পথচারী জড়ো, কিছু শুকনো খাবার আর কোক নিলাম। সামনে দেখি মাঝবয়সী এক শ্বেতকায় গিটার বাজিয়ে চলেছে; সামনে বিছানো কাপড়ে লোকজন এক আধ ডলার ছুড়ে দিচ্ছে। একটু তফাতে দুই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক মুখোশ পরে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে গেয়ে চলেছে : উদ্দেশ্য কিছু পয়সা পাওয়া। এগুলো কি আমাদের দেশের রেলস্টেশন, মাঠে-মেলায় গেয়ে-চেয়ে ভিক্ষা করার আমেরিকান ভার্সন! সেখান থেকে গেলাম টুইনটাওয়ারের স্থানে, যাকে এখন গ্রাউন্ড জিরো বলা হয়। চারপাশ ঘেরা, আলোকিত; ভাবগম্ভীর একটি পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা। শীঘ্রই সেখানে নতুন উচ্চতম ভবন তৈরি হবে, শুনতে পাই।

ঠিক হলো, রাতের খাবার আজ বাইরে খাব। জীবন আমাদের নিয়ে চলল জ্যাকসন হাইটসে (Jackson Heights)। এটি কুইন্স এলাকাতেই। অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। জ্যাকসন হাইটসে ঢুকতেই অনুভূতিটা অন্য রকম হয়ে গেল। আরও একটু ভিতরে ঢুকতেই মনে হলো রাস্তার ধার থেকে আমাদের নিউমার্কেট এলাকার মতো দুর্গন্ধ বের হচ্ছে, মূত্রবিয়োগের। কয়েকজনকে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একেবারে ঢাকাইয়া স্টাইলে ঢাকার ভাষায় মোটামুটি সশব্দে গল্প করতে শুনলাম। আশপাশে দেয়ালে সাঁটানো বাংলাদেশের কিছু শিল্পীর পোস্টার। 'আলাউদ্দিন' রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম। এই আলাউদ্দিনের সঙ্গে ঢাকার মিষ্টি বিক্রেতা আলাউদ্দিনের কোন সম্পর্ক আছে মনে হলো না। কিন্তু নামটার কাটতি আছে। রেস্টুরেন্টের মালিক-কর্মচারী সকলেই বাঙালী। একটা নেপালী ছেলেকেও দেখলাম মনে হয়, টেবিল পরিষ্কার করছে। যে সমস্ত বাঙালী মেম আমেরিকা থেকে এসে আমাদের শপিং সেন্টার আলোকিত (!) করেন তাঁদেরই একজন এলেন খাবারের অর্ডার নিতে। শাড়ির ওপর এ্যাপ্রন পরেছেন। খেতে আসা লোকদের প্রায় সকলেই উপমহাদেশীয়। খাদ্য তালিকাও অনুরূপভাবে তৈরি। এ ব্যাপারটা বিলেতের একেবারে উল্টো ধরনের। বিলেত বা ইউরোপীয় দেশগুলোতে, এমনকি জাপানেও যে সমস্ত ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট রয়েছে (বিলেতে ভারতীয়-পাকিস্তানী-বাংলাদেশী মালিকানায় যে সমস্ত রেস্টুরেন্ট আছে সব ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নামে পরিচিত) তাতে খেতে আসা লোকদের অধিকাংশই সে দেশী অর্থাৎ শ্বেতকায়। কিন্তু আমেরিকাতে বাংলাদেশী (বা উপমহাদেশীয়) রেস্টুরেন্টে সাদারা খেতে আসে না। এই জ্যাকসন হাইটস্ এলাকায় শ্বেতকায় বসতিও তেমন নেই। এক সময় ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে অন্যত্র চলে গেছে। ফলে এটি এখন বাঙালী-পাকিস্তানী-ভারতীয়দের ঘেটোতে পরিণত রয়েছে। পাশেই কাঁচাবাজারের বিশাল শপিং সেন্টার। নাম 'সবজিমণ্ডি।'

পরের দিন ক্যালিফোর্নিয়া উড়াল দেব। পিংকু-সুকমল তাদের ভাড়া করা ভ্যানে চলল কেনেডি এয়ারপোর্টের দিকে। যেহেতু আমাদের ফ্লাইট দেড় ঘণ্টা দেরিতে, তাই জীবন প্রস্তাব করল, স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখার একটা সুযোগ নেয়া যাক। আমি সানন্দে রাজি। আমরা যখন ঘাটে পৌঁছি, তখন ফেরি চলে গেছে, পরেরটা আরও অন্তত এক ঘণ্টা পর। সময়ে কুলাবে না। তাই বাইনোকুলার দিয়ে দেখার চেষ্টা। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো। ম্যানহাটন ও নিউজার্সি সিটির মাঝে যেখানে হাডসন নদী আটলান্টিকের আপার বে-তে পড়েছে সেই মোহনাতে স্ট্যাচু অব লিবার্টি, অনেকটা 'গেটওয়ে অব আমেরিকা' বলা যায়। বিফল মনোরথ হয়ে আমরা কেনেডি বিমানবন্দরের দিকে যাত্রা শুরু করলাম। বাসা থেকে সেভাবেই তৈরি হয়ে এসেছিলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড়। হাজার হাজার গাড়ি, তিন-চার লাইন ধরে চলেছে, কিন্তু নিতান্তই ধীরগতিতে। এভাবে চললে নির্ঘাত প্লেন মিস করব। জীবন মোবাইলে পিংকু-সুকমলের সঙ্গে যোগাযোগ করল, ওরা এখনও রাস্তায় একই ভিড়ের কারণে। আমরা যখন বিমানবন্দরে পৌঁছি তখন আমাদের ফ্লাইটের ঘণ্টাখানেক বাকি আর সুকমলদের প্লেন উড়ি উড়ি অবস্থা। সুকমলরা সবে ভ্যান ফেরত দিয়ে বোর্ডিং কাউন্টারে পৌঁছেছে। আমরা খুব টেনশনে, কারণ সুকমল-পিংকু যদি ক্যালির্ফোনিয়া না যেতে পারে তাহলে আমরা গিয়ে কোথায় উঠব। আমাদের সময়ও চলে যাচ্ছে। আমাদের ফ্লাইট লাইনে সকলে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে চলে গেছে ভেতরে লাউঞ্জে। এমন সময় মোবাইল এলো সুকমলের, একটা ব্যবস্থা হয়েছে; আমরা যেন নিশ্চিন্তে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে যাত্রা করি। পরে জেনেছি, অবস্থা ব্যাখ্যা করাতে, অন্য একটি এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে তাদের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে; এও সম্ভব! অবশ্যই ভব্যতার নিদর্শন। দেরিতে আসার কারণ যা-ই হোক, সুযোগ থাকলেও আমাদের দেশ হলে বিমানবন্দরের কর্তব্যরতদের বদান্যতায় (!) যাত্রীর সোজা ঘরে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। যথাসময়ে আমরা অকল্যান্ড (Oakland) বিমানবন্দরে পৌঁছলাম। পিংকু-সুকমল কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছে টেলিফোন করে জানলাম। ঘণ্টাখানেক পর সুকমল তার গাড়ি নিয়ে এলো। আমরা যখন তাদের বাসায় পৌঁছি তখন পিংকু রান্নাবান্না শেষ করেছে। সানফ্রান্সিসকো বে (Sanfrancisco Bay)-এর একদিকে অকল্যান্ড, অন্যদিকে সানফ্রান্সিসকো শহর। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের কবিতা

মেঘভাঙা আলোয় স্পষ্ট দেখি

যারা চাষবাস করেন
তাদের কথা আমরা এখন বলি না,
শ্রেণী সংগ্রামের রাস্তা আমরা ভুলে গিয়েছি
নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকিয়ে এখন আর কবিতা বলি না।
আমরা এখন নিতন্দ্রী হতে চাই
মাটি বিক্রী করে দিতে চাই
পূর্বপুরুষের ত্যাগ এখন আমাদের ভাবনার বিষয় নয়।
ঝাড়ুদারের মতো আমরা এখন ঝেঁটিয়ে ফেলতে চাই
সেই সব বইপত্র যেখানে বিপ্লবের তারা বাস করে,
আমরা ভয় পাই বিপ্লবের ঋতু।
হৃদয়ের বিধানগুলো ফেলে দিয়ে
আমরা যোগাড় করি অস্ত্রশস্ত্র
ভাবি অস্ত্র হচ্ছে স্বর্গে পৌঁছবার সড়ক।
মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি মৃত কমরেডকে
তাদের কমরেডরা একটা গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়েছে
মা-বাবার কাছে
তারপর শত্রু নিধনে গেছে
তাদের এখন খুঁজে পাই না।
নির্যাতন-শিবিরে যারা আমাদের সার করে দাঁড় করিয়েছে

তারাই এখন হর্তাকর্তা বিধাতা
যারা লেখাপড়া জানে না তারা এখন উচ্চশিক্ষার বয়ান দেয়
ধর্মের বেহালা বগলে নিয়ে তারা এখন জিকির করে।
আমি তবু ভুলে যাই না সবুজ বছরগুলোর কথা
জ্যোৎস্না রাতে মৃত কমরেডরা ফিরে আসে
একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করি আর মার্চ করে করে
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাই
দেখি স্পষ্ট ভবিষ্যত টানটান আর উদ্যত হয়ে আছে,
আমরা শস্যের জামা গায়ে দিয়ে নিজেদের
গ্রামগুলো ঘুরে বেড়াই।
আমাদের পকেটে ভবিষ্যত ট্রেনের টিকেট
প্রথম ট্রেনেই আমরা ফিরে যাব পূর্বপুরুষের কাছে
মেঘগুলো জ্বল জ্বল করছে আমাদের চোখের পাতায়।
মেঘভাঙ্গা আলোয়
আমরা স্বপ্ন দেখি প্রতিটি গ্রামের ভিতর দিয়ে
শ্রেণী সংগ্রামের রাস্তা দিগন্তে চলে গেছে।

কুয়াশা ঢাকা স্টেশনে

কাজী জহিরুল ইসলাম

প্রবাসের অখণ্ড অবসরে যখন ভালো কিছু খুঁজছি পড়ার জন্য, সবকিছু আড়াল করে আমার দৃষ্টির সামনে একটি শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখশ্রী উদ্ভাসিত হলো, যাঁর রচনা শুধু পাঠ নয়, অধ্যয়ন করব বলে আমি প্রতিজ্ঞ, তিনি কবি আল মাহমুদ। গত এপ্রিলে মাসখানেকের ছুটিতে ঢাকায় গিয়েছিলাম, তখনই আমার হাতে তুলে দেন একটি স্বাস্থ্যবতী গ্রন্থ, যার কভারে লেখা 'শ্রেষ্ঠ আল মাহমুদ।'

অতি সম্প্রতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাংলাভাষী তারুণ্যের উচ্ছ্বাসে উদ্দিপ্ত এবং ক্ষিপ্ত কবি লেখকদের সঙ্গে আমার সওয়াল-জওয়াব হচ্ছে। আজকের কাব্যভাবনা নিয়ে এই সময়ের প্রখ্যাত তরুণ কবি-লেখকদের ভাবনাচিন্তাপ্রসূত মতামতের সঙ্গে বাহাস হচ্ছে। এর সবকিছুই সম্ভব হচ্ছে ইন্টারনেট এবং ই-মেইলের কল্যাণে। আমি দূরত্বটা মাপার চেষ্টা করছি। আল মাহমুদ থেকে আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, দূরত্বটা কতখানি, তা নির্ণয় করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কঠিন হচ্ছে গ্রহণ-বর্জনের হিসেব মেলানো। আমি অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না, সাহিত্যে গ্রহণ-বর্জনের তেমন একটা অবকাশ রয়েছে। প্রবহমান সময়ের সিঁড়িপথ নির্মিত হয় গৃহীত-বর্জিত সবকিছু দিয়েই।

বাংলা সাহিত্যের চারপাশে উটপাখির ডিমের মতো যে কঠিন এবং বিশাল বলয় নির্মাণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ত্রিশের কবিরা তা ভেঙেছিলেন মাত্র। সুখপাঠ্য আধুনিক সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষাকে ম্যাচিউরিটি দেবার জন্য আমরা সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে, একথা অনস্বীকার্য। আর বাংলা কবিতাকে রবীন্দ্র বলয়ের ঘূর্ণাবর্ত থেকে টেনে বের করে এনে একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্য আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ ত্রিশের মেধাবী কবি বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের কাছে। কিন্তু সেই খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কাব্যের নগ্ন সুন্দরীকে আবরণ এবং আভরণে সাজিয়েছেন পঞ্চাশের কবিরাই, কবি আল মাহমুদ তাঁদেরই এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি। এরই ধারাবাহিকতা চলছিল আশির দশক অবধি, নব্বইয়ের কবিদের কাছে যা একঘেয়ে এবং পানসে ঠেকে। ফলে নব্বইয়ের টগবগে তরুণরা বাংলা কবিতার খোল-নলচে পাল্টে ফেলতে চাইছেন। ত্রিশের দশক থেকে আশির দশক অবধি বিস্তৃত বাংলা কবিতার চারপাশে তারা দেখতে পাচ্ছেন আরও একটি উটপাখির ডিম। সেই ডিমে তা দিয়ে ডিম ফুটিয়ে নব্বইয়ের কবিরা উটপাখির বাচ্চা বের করে এনে মরুভূমিতে দৌড় শেখাচ্ছেন। তারা সেই উটপাখির গায়ে অলৌকিক পালক লাগিয়ে ওকে ওড়াতে চাইছেন মহাশূন্যে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের এক তরুণ কবি, সব্যসাচী স্যান্যাল, আমার একটি কবিতার ওপর আলোচনা করতে গিয়ে রবার্ট ফ্রস্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'কোন কিছু না বুঝেই যা ভালো লাগে, তা-ই কবিতা।' অর্থাৎ কবিতায় বোঝাবুঝির কিছু নেই। আমি তার বক্তব্যের সঙ্গে একটুও দ্বিমত পোষণ না করে বলছি, বুঝবার পরে যা আরও একবার ভালো লাগে, সেটাই কালোত্তীর্ণ কবিতা। পাঠক তা দীর্ঘদিন মনে রাখেন। কবি আল মাহমুদ সেই কালোত্তীর্ণ কবিতার সৌধ রচনাকারীদেরই একজন। তিনি প্রমাণ করেছেন– কবিতা হচ্ছে চমক এবং বুদ্ধিবৃত্তি– এই দুয়েরই সমন্বয়। যে কবিতায় বক্তব্য, দর্শন, রহস্য সবই আছে কিন্তু সুখপাঠ্য নয়, সে কবিতার আবেদন যেমন সীমিত, তেমনি যে কবিতা সুখপাঠ্য কিন্তু লক্ষ্যহীন, সে কবিতাও দীর্ঘদিন কেউ মনে রাখে না। আল মাহমুদ নিজেও বলেছেন, 'আমি সুন্দর কিছু দেখলে সুন্দর বলে স্বীকার করি। কিন্তু আমি এর ভেতরটাও দেখতে চাই। ... নৈশব্দেরও একটা শব্দ আছে, একটা বিষয় আছে।' এরপর তিনি আরও গূঢ় রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন, 'এখন সেখানে পৌঁছুতে চাই, যেখানে আর কোন শব্দ নেই।' (আমি, আমার সময় এবং আমার কবিতা : কবির সৃজন বেদন, পৃষ্ঠা ৪২)।

দীর্ঘ অর্ধশতক ধরে নিরলসভাবে কাব্যচর্চাকালে কবি আল মাহমুদকে আমরা কখনই একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা আঙ্গিকে স্থির থাকতে দেখিনি। একই গুণ লক্ষণীয় কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যেও। এই অস্থিরতা সৃজনশীলতার তীব্র তাড়নারই বহির্প্রকাশ। অনেকেই কবির এই অস্থিরতাকে স্খলন বললেও কবি আল মাহমুদ তা কবিসুলভ স্বাভাবিকতায় বারবারই হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। কবি আল মাহমুদকে খুব কাছে থেকে দেখার এবং কিছুটা জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এমনও সময় গেছে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাই আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছি। একদিন তাঁর মুখোমুখি বসে এই 'স্খলন' প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম। তিনি বেশ কিছুক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, 'আমি কখনই অবিশ্বাসী ছিলাম না।' কিন্তু কবির 'লোক লোকান্তর', 'কালের কলস' কিংবা 'সোনালী কাবিন' পড়ে আমরা তাঁর মধ্যে কিছুটা দ্বিধা, সংশয় দেখতে পাই বৈ-কি। পরিণত বয়সে এসে সেই দ্বিধার কুয়াশা কেটে যাওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক।

'আমাকে দুঃখের চেয়ে নতুন কোনো দাহ কেউ
দিতে পারেনি।
আমাকে শোকের চেয়ে সত্য কেউ
বোঝাতে পারলো না। আর
কষ্টের চেয়ে কঠোর স্পর্শ কোনদিন
ছোঁবে না আমাকে।
হে মোহান্ত, তেমন কোনো শব্দ জানো কি
যার উচ্চারণকে মন্ত্র বলা যায়?
হে মোয়াজ্জিন, তোমার আহবানকে
কী করে আজান বলো, যা এত নির্দিষ্ট
আর হে নাস্তিক
তোমার উচ্চকণ্ঠ উল্লাসকে কোন শর্তে আনন্দ বলো
যা এত দ্বিধান্বিত
তাই আমি নাস্তিক নই
বিশ্বাসী নই'
(পিপাসার মুখ, কবিতাসমগ্র, পৃ. ৩৮)

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঘড়িতে পেন্ডুলাম হয়ে দুলতে দুলতে তিনি কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে একটি ঘণ্টাই বাজিয়ে জগতবাসীকে শুনিয়েছেন, একটি ঘোষণাই বারবার দিয়েছেন, 'আমি সেই ধ্বনির জাদুকর।' অর্থাৎ তিনি কবি। গত অর্ধশতক ধরে সমস্ত সংশয়, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কোন্দল, সমস্ত বিতর্ক ছাপিয়ে আমরা একজন পূর্ণাঙ্গ কবিকেই আবিষ্কার করেছি তাঁর সমস্ত কর্মের মধ্য দিয়ে। তাঁর জীবনাচার একজন কবির জীবনাচার, তাঁর গদ্য একজন কবির গদ্য, তাঁর ভ্রমণ একজন কবিরই ভ্রমণ, একথা বলতে আজ আর বোধ করি কারও দ্বিধা নেই। 'পিপাসার মুখ' কবিতাটি রচনার অল্প কিছুকালের মধ্যেই এই দোদুল্যমানতা কেটে গিয়ে তাঁর বিশ্বাসের পায়রা ডানা গুটিয়ে বসেছে। কিন্তু তখনও আমরা দেখি তিনি কবি, ধর্মের আলখেল্লা তাঁর কবিসত্তাকে এতটুকুও ঢেকে দিতে পারেনি। আজ কবি আল মাহমুদের ৭০তম জন্মদিনের প্রাক্কালে তাঁর কবিখ্যাতিরই জয়গান করছি, যদিও তাঁর কথাসাহিত্যের ব্যাপ্তি ও কীর্তি কবিতার চেয়ে কম নয়। আমি তাঁর কবিতার মতো গদ্যেরও বিশেষ ভক্ত। শেষ করবার আগে কবি আল মাহমুদের আরও একটি কবিতা থেকে খানিকটা উদ্ধৃতি দিতে চাই :

'আমার মনের মধ্যে কেবল ঘুরে ফিরে স্টেশনটা আসছে
শুধু নামটাই খেয়া নৌকায় ফেলে আসা পুঁটলিতে চিরকালের

জন্য হারিয়ে এলাম। অগত্যা
রেল কাউন্টারের ঘোলা চশমাপরা টিকেট বিক্রেতাকে
এমন একটা স্টেশনের টিকেট দিতে বললাম
যেখানে কুয়াশা ঢাকা স্টেশনের প্লাটফরমের পাশে
আমার জন্য কেউ না কেউ ঘোমটা তুলে
যাত্রীদের ওঠানামা দেখছে। আর
তার দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে অপেক্ষার
ব্যাকুল বাষ্প'

কবি আল মাহমুদ, সেই কাঙ্ক্ষিত স্টেশনে আপনি এসে পৌঁছেছেন অনেককাল আগেই। অপেক্ষার ডালি নিয়ে আমরাইতো দাঁড়িয়েছিলাম। আমরা আপনাকে খুব শিগগিরই আর কোনো স্টেশনের ট্রেন ধরতে দেবো না।

পহর

ভাস্কর চৌধুরী

(গত সংখ্যার পর)

তখন অন্ধকার। চাঁদের আলো মাঝে মাঝে খাঁড়ির ভেতর পড়ে। তাতে করে পথের নিশানা আর বাদলের সেই অতি ভাবুক চেহারাটা সে দেখতে পায়। তখন সে কথা ঘুরাবার জন্য একটা পথ খোঁজে, 'বুইজলেন, আপনার সুরত দেইখ্যা মনে হয় আপনি বাউল।' বাদলও নাদানের কায়দায় বলে, 'কই আর বাউল হইতে পারলাম ভাইজান! বাউল হইতে হইলে ম্যালা গুণ লাগে।'

তখন সেই কালে ও সময়ে নজরুল ইসলাম কথাটার একটা সুতো স্পর্শ করে, 'আপনি সংসার ত্যাগী, বাউলও সংসার ত্যাগী। আপনি নিজে কামাই করেন না, কিন্তু বাউলের মতই খাবার জোটে আপনার।'

বাদল বলে, 'চুল দাড়ি রাইখা সংসার ত্যাগী হইলেই কি বাউল হওয়া যায়?'

কাজী নজরুল ইসলাম বলে, 'হামি নিজে বাউল হইয়া গানে গানে জীবনটা সার্থক করিতে চাহিতাম। কিন্তু বুঝেন, সেটা হামি হইতে পারি নাই, যেমন আপনি সুরতে বাউল, কিন্তু স্বভাবে হইতে পারিলেন না।

বাদল এবার একটা ঢিল ছুড়ে অন্ধকারে। বলে, 'কেনে, স্বভাবে কি লাগিছে?'

লোকটা বলে, 'যে রকম লাগিলে মানুষ বাউল থাকতে পারে না। সে রূপ আপনার মইধ্যে আছে।'

বাদল নজরুল ইসলামের এই আত্মবিশ্বাসটাকে চাঙ্গা করার জন্যে বলে, 'কেনো, খুনী খুনী ভাবটাব আছে নাকি?'

হাসে নজরুল ইসলাম। ভরা জ্যোৎস্নার ভিতর খিটখিট হাসে। 'বুইজলেন ভাইজান, আপনার ভিতর কি সে রকম কিছু আপনি টের পান? খুনের নেশা কিছু? হামি কি সে রকম কিছু বুলিছি? বুলেন, বুলিছি কি? আপনি হঠাৎ অমন কথার ভিতর গেলেন যে? পাঁচদিন আগে এই খাড়ির আরেক বোন মাকুন্দোর পারে তালোন্দো গাঁয়ে রাইতে যে খুনটা হইল সেই খুনের খবরটা জানেন নাকি?'

এবার বাদলের ফণা নামে। সে মুহূর্তেই শীতল হয়ে যায়। সে শীতল হয় এবং তার ঝোলা থেকে একটা বাঁশি বের করে। সেই বাঁশি ঠোঁটে তুলে ফুঁ দ্যায়।

নজরুল ইসলাম হঠাৎ এমন অবস্থার মধ্যে পড়ে বিহ্বল হয়। কী সুর! সে তো সুরেরই মানুষ। রক্ত কি অস্বীকার করে তার মূলকে? করে কি? করলে নজরুল ইসলাম তখনই বাঁশি হাত থেকে কেড়ে ছুঁড়ে ফেলতো। কিন্তু সে তা করে না। সেই কালে ও সময়ে কিছুটাক্ষণ মাত্র নজরুলের বিস্ফোরণ ঘটে। সে সুরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে। সুর বলে, তুমি কোথা থেকে এলে আর কোথায় তুমি যাবে তার তুমি কীইবা জানো? সকল জানার স্বরূপ আল্লাহ সেই কথাটা মাইনো। সুর এই কথা বলে। নজরুল ইসলাম শেষ পর্যন্ত বিস্মরণ থেকে ফিরে আসে। সে মুহূর্তে পেছন থেকে গলুই-এর কাছে যায় এবং বাদলের মুখ থেকে বাঁশিখানা কেড়ে খাড়ির জলে ফেলে দ্যায়– 'এইঠে লয়, এইঠে লয়, এইঠে বিপদ বুঝিবেন না? বিপদ আছে এইঠে। এইঠে বাড়িঘর আছে। এতো রাইতে নৌকা থাইকা সুর গেইলে পর মানুষ আসিবে। বিপদ আছে ম্যালা। বুঝিবেন, বাঁকা উঠানে নাচিবেন না। এইঠে আপনার বাঁশি বাজাইবার শখ জাগিলো গো? হায়।'

নজরুল ইসলামের এতো কথার অর্থ বুঝতে দেরি হয় না বাদলের। সে নিজের এই প্রবৃত্তির তাড়নাটুকুর জন্যে ভীষণ দমে যায়। সে চুপ করে বসে। সে ঠাণ্ডা হতে হতে মুহূর্তে নিজের পুরনো অবস্থানে ফিরে আসে। সে তখন নজরুল ইসলামকে ফের দেখতে পায়। সে আরও কিছু কথার অপেক্ষা করে। তখন নজরুল ইসলাম যা বলে তার সহজীকরণ করে বাদল এই কথাগুলো দাঁড় করায় :

সন্ধ্যার পরে তারা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, যখন বাদল বুঝতে পারে যে, তাদের পথ দীর্ঘ এবং তাদের এই খাড়ির ভেতর দিয়েই সেখানে যেতে হবে। তখন সে এই প্রস্তাব করে যে, তারা পর্যায়ক্রমে লগি ঠেলবে। আর তার এই প্রস্তাব শুনে লোকটা তাকে বলেছিল, 'পারলে মন্দ হবে না। দ্যাখেন, পারলে মন্দ কি?'

তো পর্যায়ক্রমে লগি ঠেলতে ঠেলতে মধ্যরাত্রে একটু ঝিমুনি আসে তার। সে তখন নজরুল ইসলামের হাতে নৌকা ঠেলার দায়দায়িত্ব দিয়ে গলুইতে বসে। সে বলে, একটু চোখে পানি দিই। এই বলে সে চোখে বার কয়েক খাড়ির জল ছিটিয়ে চোখ ঠাণ্ডা করে। সে বলেনি যে সে পনেরো প্রহর হেঁটে তারপর তার নৌকায় উঠেছিল এবং তখন আরও চার প্রহর গত হয়ে গেছে। সে পাশে তাকায়। কাশবন শেষ হয় না। মুখভর্তি সাদা ফুল নিয়ে গোটা খাড়িকে যেন ঘিরে আছে। আর উঁচু পাড়ের তলায় চিকন জলের রেখায় নৌকাখানা চলছে। উপরে পুরুট চাঁদ সাদাকাশের ওপর দিয়ে খাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে আলো দ্যায়। তাতে এগিয়ে আসা কাশবনের ছায়া নড়ে। সেই অতি হাল্কা ছায়া খাড়ির ভেতর একটা মায়াবী ছায়া তৈরি করে। বাদল তাই দ্যাখে। সে ভাবে এমন জল, এমন আলো, এমন পাড়ের খাড়ি আর তার ভিতর এমন নির্জন নৌকা– এমন দৃশ্য সে তো জনমে দ্যাখেনি। সে সহজে এর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারে না। তবে সে এতদিনে এইখানে কি করেছে? কিছুই কি দ্যাখা হয়নি তার? তার দুই বছরের রাত্রি জাগরণে কি এই খাড়ি চোখে পড়েনি? এই কাশবনের ভিতর দিয়ে দুটি বছর সে কখনও কখনও হেঁটে হেঁটে হারিয়ে থেকেছে। সে চাঁদের আলোতেই এই কাশবনে কখনও কখনও ঘুমিয়ে পড়েছে। সে চাঁদের আলোর নিচে কাশবনে ছোট কুঁড়েতেও ঘুমিয়েছে। সে অবশ্যই সবই দেখেছে। কেবল এসবের কোন যোগসূত্র নিয়ে কখনও কোন চিন্তা করেনি। এখন সে ক্লান্ত। সে এখন একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যের হাতে নিজেকে অর্পণ করে মূলত নিজের আত্মার দরজাটা খুলে দিয়েছে। রাতে যখন সে একবার কাজী নজরুল ইসলামকে বলেছিল, সে বিল সিমলা গ্রামে যাবে, তখন এই পরিবেশের ভেতরেই খিটখিট করে হেসে উঠেছিল কাজী নজরুল ইসলাম, 'বিল সিমলা? কোনঠে পাইবেন? সেই গাঁখানা কি এইঠে আছে? সামনের দশ মাইল যুদি যান, যুদি এই খাড়ির শেষ মাথায়ও যান তো আশপাশের কোথাও আপনি এই গাঁয়ের ঠিকানা পাইবেন না। এইঠে বিল সিমলা নাই। সিমলার বিল একখান আছে। দূরে আছে। কিন্তু ঐঠে তো গাঁ নাই গো। ঐঠে কুনো গাঁ নাই। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, ঐঠে বিল সিমলা বইলে কুনো গাঁ নাই। সিমলার বিলের ভিতর মাটি তুলে যুদি কুনো গাঁ তুলে বা আপনি বা আপনার কেহ জানা আপনজন ঘর তুলে আর আপনাকে জানায় তো হইতে পারে। ঐ ঠিকানার মালিকের তৈরি কোন্ গাঁ সে-খানা। সে বানাইছে বা আপনারা বানাইছেন বা আপনারা বানাইবেন। ঐঠে বিল সিমলা বইলে নতুন কিছু তৈরি হইতেও পারে। কিন্তু এখন সিমলার বিল ছাড়া ঐঠে কোন গাঁ নাই জানিবেন।

এটুকু জানার পর আর কোন দ্বিধা তাকে স্পর্শ করেনি। এতদিনের জীবনাচরণে সে কাজী নজরুল ইসলামের কথার অর্থটার মুখ ধরে ফেলেছে। তাই সে এখন নিশ্চিন্ত বলেই হয়তো এই প্রকৃতির সঙ্গে নিজের অবস্থানকে এক মায়াবীরূপে আবিষ্কার করে। সে তো কোনদিন এমন নিশ্চিন্ত জীবন পায়নি যে, কিছু দেখবে! তার কাছে স্পষ্ট কোন ছবিও নেই। মাটির সঙ্গে গাছপালা চাঁদ আর তার আলো, নদী বা খাড়ি, কাশবন বা তার দ্বারা সৃষ্ট কোন সৌন্দর্যের বোধ তার ভিতর জন্ম নেয়নি। কিন্তু আজ তাকে সেই মায়ায় ধরল। সে এই নতুন প্রাপ্ত অনুভবের কথা কাজী নজরুল ইসলামকে বলে না। সে তখন তার পা দু'খানা সামনে ছড়িয়ে গলুইয়ের কাঠের উপর দুটি হাতের পাতা বিছিয়ে তার উপর মাথাখানা দিয়ে দু'চোখ ভরে সাদা চোখে আকাশ, চাঁদ, কাশবন ও তার ছায়া, বাঁশের ছায়ার নড়াচড়া, মানুষের শব্দহীন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা খাড়ি আকুন্দোর ভিতর বিশাল একটা বোধকে গ্রহণ করতে থাকে। এখানে কোন অবিশ্বাস নেই, কোন এ্যাকশন নেই, কোন সতর্কতা নেই। কেবলই নিজেকে পরম বিশ্বাসে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে পরম সুন্দরকে দ্যাখে সে।

ধীরে ধীরে কথা বন্ধ হতে থাকে। এবং বাদল আবার যখন কথা বলে তখন খাড়ির ভিতর রোদ ঢুকছে।

সে তাড়াতাড়ি উঠে বসে। সে নিজের অবস্থানটা একবার মাপতে চেষ্টা করে। প্রথমবার সে ব্যর্থ হয়। সে নৌকার গলুইতে বসে নজরুল ইসলামকে দ্যাখে। নজরুল ইসলাম তখন নিজ মনে খাড়ির জল দিয়ে ছাতু তৈরি করছিল। সে ছাতু তৈরিরত অবস্থায় নজরুল ইসলামকে দেখতে দেখতে খাড়ির উপর দিকে তাকায়। এখানে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। লোকজনের শব্দ ভাসে না। সামনে পিছনে কোন নৌকাও সে দ্যাখে না।

সে চারদিক দেখবার পর গতরাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত কথাবার্তার শেষটুকু মনে করতে পারে এবং সে তখন বর্তমানে ফিরে আসে। গত রাতে সে খুব ঘুমিয়েছে। এখন শরীরটা সামান্য ব্যথা ব্যথা লাগে। অনেকদিন পর বহুদূর হাঁটা নাকি এমনভাবে শোয়া–সবই তো সহ্যের মধ্যে ছিল। তারপরও যে ব্যথা হচ্ছে এটা সে সত্য মনে করে। নজরুল ইসলাম তখনও একাগ্রচিত্তে ছাতু বানিয়ে তার দু'পাশে দুটো আস্ত পেঁয়াজ ছিলে রাখে। তারপর সামনে তাকালে সে সদ্য ঘুম ভেঙ্গে ওঠা বাদলকে দ্যাখে।

‘যাউক, ম্যালা ম্যালা নিন্দাইছেন। ভালো লাগিল। দরকার ছিলো। সামনে ম্যালা হাঁটিবার পথ আছে। ফের কখন নিন্দাইবেন কে জানে! ছাতু খাইতে পারিবেন? আর কুনো খাইদ্য নাই। আপনার রুটিও তো শ্যাষ। ছাতুটা ভালো। খাইবেন?’

এভাবে তারা কাছাকাছি আসে। লগি পুঁতে তাতে নৌকাটা বাঁধে। তারপর তারা দু’জন কাছাকাছি আসে। তারা একই থালার ছাতুর দলা থেকে একটু একটু করে ছাতু কখনও গুড় দিয়ে আর কখনও পিঁয়াজ দিয়ে খেয়ে চলে। যেন এক ভুবনমোহিনী ক্ষুধা তাদের ভিতর ক্ষুধার তেজ দেখছে আর তারা সেই তেজে ছাতু উজাড় করে চলেছে। তবে ছাতু খাওয়াটাও একটা অভ্যেসের ব্যাপার। খাদ্য তালিকায় যাদের জীবনে ছাতু অনবরত আসতে থাকে তারা ছাতু কত প্রকার ও কী কী তা যেমন জানে, তেমনই কেমন করে কোন্ সময়ে ছাতু খেলে কি কি অনুষঙ্গ দিয়ে খাওয়া যায় এবং তার স্বাদ কত রকমের হতে পারে তারা সেটা উপলব্ধি করতে পারে। তবে বরেন্দ্রের মাঠে ছাতু খাওয়ার ভিতর তেমন বৈচিত্র্য নেই। গুড় লঙ্কা আর পিঁয়াজ পেলেই হলো। এই শক্ত কঠিন তার আদিগন্ত বরেন্দ্রের মাঠে আর খাড়িতে যেখানেই হোক, ছাতু কেবল জীবন বাঁচাবার জন্যেই তারা খায় এবং এই প্রকারে বাদলও ছাতু খেতে পারে। তাই দীর্ঘকালের অনুপস্থিতির পরেও ধীরে ধীরে ছাতু খেতে অসুবিধে থাকে না। ব্যাপারটা নজরুল ইসলামকে আরো একটা বিষয় শনাক্ত করতে বাধ্য করে যে, এই লোকটা এখানে এর আগে অনেক দিনই ছিলো এবং সে অনেকদিন এই ছাতু খেয়েই জীবন কাটিয়েছে। অতএব বরেন্দ্র সম্পর্কে জ্ঞান দান করার ব্যাপারে সংযত হয় সে। তার বদলে এক থালায় খেতে খেতে মনের ভেতর ভাব আসে। সে বাদলের দিকে তাকিয়ে অনেকবার এবং গতরাতে প্রায় অনেক সময়ই তাকিয়ে কত কী যে ভেবেছে! এসব থেকে প্রাপ্ত অনেক জিজ্ঞাস্য ব্যাপার তাকে অনবরত ভেতর থেকে প্রলুব্ধ করে। সে ছাতুতে মনোযোগদানকারী লোকটাকে জিজ্ঞেস করে, ‘ভাইজান, আপনাকে কয়টা কথা পুছাই? ইচ্ছা হইলে উত্তর করিবেন। মনের ব্যাপার, মনে আসিলো।’

বাদল বলে, ‘আরে পুছান। এখন আর অসুবিধা কী? পুছাইয়া নেন।’

‘আপনি মাঝে মাঝে বাড়ি থেকে ধরেন হারিয়ে যান। যান না? ফের ধরেন, বাড়ি ফিরে আসেন। ফের আপনি ধরেন বাড়ি ফিরে ফের হারিয়ে যান। ফের আপনি ম্যালাদিন হারিয়ে থাকেন। ফের ধরেন আপনি বাড়িতেই ম্যালাদিন থাকেন। আর একদিন হঠাৎ হারিয়ে যান। আপনি ধরেন—হারিয়ে থাকেন। কিন্তু ঐ সময়ে আপনি কোথাও না কোথাও ফিরে যান। ধরেন আপনি হারিয়ে থাকা অবস্থায় ফিরে ফিরে যান আর একদিন হারিয়ে গিয়ে কোনদিন না ফিরেন? ফের ধরেন আপনি ম্যালাদিন বাড়ি থেকে হারিয়ে হারানো কালে রোজ রোজ কোথাও ফিরেন এবং একদিন বাড়ি ফিরে যান। তারপর আবার হারান। তারপর আপনি হারিয়ে হারিয়ে হারিয়ে আর বাড়ি না ফিরেন আর কোথাও না ফিরেন আর কোনোদিন না ফিরেন?’

এতো কথা শুনে কথার বাঁকে বাঁকে কান রাখছিল বাদল। কথার ভেতর চাপা উত্তেজনা ছিলো। বাদল ঠাণ্ডাভাবেই বলে, ‘ধরেন কেহ কেহ তো বাড়ি ফিরে থেকে যায়? সে হারায় না। এমন হয় না?’

নজরুল ইসলাম ছাতুর ভেতর গুড় পুরে মুখে তুলে কিছুক্ষণ চুপ থাকে। তারপর সে কথাটা বুঝতে চেষ্টা করে।

‘হইতেও পারে। কিন্তু না হওয়াটাই স্বাভাবিক। তারপরেও হইতেই পারে। যে থাকে সে তো হারাইবার জন্যে আসে না গো ভাই। সে কেবল মজা করতে আইসছিলো বুঝিবেন। মরিতে আইলে মরণই তো ভালো। নাকি?’

বাদল আর আড়াল পায় না। কোথায় আড়াল? এখন বস্তুত নজরুল ইসলামের সামনে তার সকল গন্তব্য প্রকাশিত, নাঙ্গা। ফলে তার ভেতরেও কিছু কথা উথলায়। অথবা সে নিজেকে যাচাই করবার জন্যেই কথাগুলো বলে, ‘আচ্ছা, আপনি তো ম্যালা পুছাইলেন। ধরিতে গেলে পিছলাইয়া যায়। নিজেদের কথা। তাই কোনরকমে বান্ধিলাম। তো বলেন, এই আমরা এখানে, কোথায় আমি, কোথায় বাবা, কোথায় মা, কোথায় সুখ, কোথায় আনন্দ, কোথায় বা জীবনের সাধ? সব বাদ দিয়ে এই যে ঘুরছি, মানুষ নষ্ট হচ্ছে। মানুষ বেঘোরে মরছে। সেই ঠ্যালায় আবার আমরা না চাইলেও গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে ফেলছে তার শোধ নিতে। কিন্তু তাতে আমরা মরি না। তো আমরা কি এতো মৃত্যুর দায়িত্ব দিয়ে মানুষের মঙ্গল করতে পারবো?’

নজরুল ইসলাম ভাবিত হয় না। সে উত্তর খোঁজে একটা। উত্তরের ভাষাটাই দরকার তার। সে বলে, “এইটা কি বুইললেন, আপনি সকল কিছু জাইনা এইঠে আইসছেন। আপনি সংগে এইঠের লোকও নিইছেন। আপনি এইঠের ম্যালা লোককেও আপনার মত কাজ শিখাইয়াছেন। এখন মধ্যমাঠে আপনি কি সকলকে ল্যাংটা ফেলিয়া বাড়ি ফিরিতে চাহেন? তো হামি এখন কাকে পুছাই যে, আপনাদের ডাকে যুদ্ধ কইরা হামি ভুল কইরছিলাম নাকি? কোনটা কাকে পুছাইবো? আর পুছাইলে তার উত্তর যুদি ‘না’ হয় তো তাতে কি?”

আর কোন প্রশ্নের সাধ জাগে না। তারা ছাতু খাওয়া সমাপ্ত করে নৌকায় হাত দ্যায়।

সন্ধের এক ঘণ্টা আগে হঠাৎ খাড়ির মুখটা চওড়া হতে থাকে। চারদিকে সুন্দর কাশবন। এক্কেবারে খাড়ির পাশে দাড়ির মত সেঁটে আছে। যেনো কোন বৃদ্ধের দাড়ি এই পর্যন্ত এসে ঠেকেছে।

লগি ছিলো বাদলের হাতে। বাদল এই কাশবন দেখতে দেখতে হঠাৎ এক বদ্বীপ দ্যাখে সামনে। আর অজান্তে নৌকা আর মানুষের কোলাহল সে দেখতে ও শুনতে পায়। এবং সে সেসবের সামনে দাঁড়ায়। নৌকাখানা হঠাৎ ঘুরতে আরম্ভ করে এবং কাজী নজরুল ইসলাম হঠাৎ গলুই থেকে দৌড়ে হাল দিয়ে নৌকা এক পাশে দাঁড় করায়। এই আকস্মিক ঘোরাঘুরির পর নৌকা শান্ত হলে এবার বাদল নিজেকে এই অবস্থানে দ্যাখে যে, খাড়ি এ স্থানে ডানে আর বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। সামনের ভূমিকে ‘ব’-এর মতো রেখে দুদিকে চলে গেছে। আর ‘ব’ দ্বীপে মানুষের মেলা। চরকিতে বয়স্ক আর বালক এক সঙ্গে নানা রঙের জামা গায়ে ঘুরছে। মাঝে মাঝে নানা রঙের তাঁবু। দু-একটা বড় তাঁবুকে ঘিরে সেসব তাঁবু পাতা আছে। নজরুল ইসলাম বলে, “ঐঠে রোজ রাইতে সার্কাস হয়। এই যে ‘ব’-এর মতন জমিন দেখছেন, ঐঠের মাঠ, মানুষ আর জমিনে ভরা। ঐঠে ম্যালা বসতি। মানুষ আনন্দ করে। শত দুঃখের মানুষ এইঠে জুয়ো আর কার্নিভালে আরো আরো হেরে সর্বস্বান্ত হয়। এইঠে দেইখছেন বাইদানীদের নাউ। ম্যালা নাউ। সাপ খেলা আর চিকিৎসা, ফটকাবাজির তাবিজ, তন্ত্র-মন্ত্র সব এদের জানা আছে। দ্যাখেন কি বাহারী নৌকা! বড়ই সুন্দর এই জায়গা। আর দুদিকে আকুন্দোর খাড়ি। ডান দিকে গেলে আপনি পাইবেন দুপাশে গাঁয়ের পর গাঁ। কাশ আর কুশারের আবাদ। মাষকলাই-এর চাষ, ছোলা আর মসুর সবুজ হয়ে এপারের জমিনে হেলছে দুলছে। আর যুদি বামে যান তো পাইবেন সিমলার বিল। জনমানুষশূন্য। জল আর নলখাগড়ার বন। মাঝে মাঝে লাটাই আর কাঁটাবনও পাইবেন। মানুষের সাড়া পাইবেন না। যাইতেই রাইত। কি করিবেন? দ্যাখেন, ঐ রঙিন নাও থেইকা এক বাইদানী ডাকে। হামি যাই। থাকি এক পহর। আপনি ভাবেন এক পহরেই সব ঠিক করেন।’ বাদল বলে, ‘একখান কথা বলেন। তারপর যান। ঐখানে নৌকাটা এতো ঘুরলো কেন? পানির চাপ, স্রোত, এসব কি ওখানে ঘুরছিলো?’ নজরুল ইসলাম বলে, ‘টাউনিয়া’ মানুষ। নায়ে চড়েন তো চালান না। তো সেটাও ভাবিবেন। মনে রাইখেন, আপনি এই খাড়ির এক কোমরের ভাঁজের রহস্য জানতে জানতে হামি সামনের যে কোন নদীর একশো ভাঁজ বিনা প্রশ্নে আরামে পার হইবো। তারপরও আপনি ফের বুলিবেন, ঐঠে পানির চাপ কত? নামান দেখি সামনের নাউ-এ আর প্রশ্ন না বাড়িয়ে বাদল রহস্যময় কাজী নজরুল ইসলামকে বাইদানীর রঙিন নৌকায় নামিয়ে দ্যায়। বাইদানী ডাকে, আয়, আয়, তুই-ও আয়।

কাজী নজরুল ইসলাম বলে, ‘ওর চাইয়া পিছলা সাপ তুই জীবনে আর দেখিবিনা। ওকে ডাকিস না। আসিবে না।

কথাগুলো এই ভর সন্ধে বেলা যোগ বিয়োগ করার আগেই বাদল এই বদ্বীপের বাঁকে বাঁকে কাশবনের সাদা ফুলের উপর দিয়ে কালো আর মেটে হাঁসের ঘরে ফেরার ডাক শোনে। সে এই চওড়া খাড়িতে কচুরিপানার উপর রঙিন ফড়িং-এর ঘোরাঘুরি দ্যাখে। তার মনে হয় প্রতিটা কচুরিপানার ভেতর নীল রঙের ফুল ফুটে আছে। আর সেই নীলের মাঝে একটু হলুদ সাদা, তারপর ফের নীল। এমনি সুন্দর হয়ে ব-দ্বীপ তার আঁচল বিছিয়ে সেজে আছে। বেগুন রঙের ছড়াছড়ি। মানুষের আনন্দ হাসি রঙ হয়ে ফেটে পড়ে। আর সামনে উদাত্ত আকাশ। সাদা মেঘ নীল আকাশে কালচে মেঘগুলোকে যেন তাড়া করে। আর বাদলের মনে হয় সে মুহূর্তে কাশবনের সাদা রঙের সংগে ফড়িং-এর লালচে রঙের আভা মাখায়। তার ভেতর কচুরিপানা নীল আর আনন্দগুলো শতেক রঙ দিয়ে আকাশের ইজেলে একটা ছবি বসিয়ে দ্যায়। এই মেলা, ঘরবাড়ি, চওড়া খাড়িটুকু, মানুষ ও তাদের হাড়ের ভেতরের বেদনা ও বাইরের আনন্দ ও বাইদানীর মুখ দিয়ে একটা আস্ত ছবি বানিয়ে ফেলে। আর আশ্চর্য হয়ে দ্যাখে এ তারই দ্যাখ্যা দুঃখিনী দেশের চিত্র।

সে আর দেরি করে না। তাড়াতাড়ি নৌকার গলুইখানা বাম দিকে ঢুকিয়ে দ্যায়।

বিমূর্ত-ভূতে পাওয়া মূর্তিমানেরা

ওয়ায়েদ উল হক

আমাদের চারপাশে এমন কিছু অবাক করা আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে যা বাস্তবকে হার মানায়। কিছু কিছু জ্ঞানী-গুণীর উক্তি আছে যা কল্পকাহিনীর মতোই বিস্ময়কর মনে হয়। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। বাস্তবতা রূপকথা অপেক্ষাও অকল্পনীয় মনে হতে পারে। দিনের আলোর মতো সত্যি, অথচ মনে হয় লোক-হাসানো জোক বা জেস্ট বা ঠাট্টা মশকরা।

জনৈক শিল্পী নদীর ধারে বসে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকছেন। আঁকা শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি নামলো। তিনি সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে গেলেন। শুধু যে কাগজে তিনি নানা রঙের তুলি ঘষেছিলেন সেই কাগজখানা সেখানে মাটিতে পড়ে রইলো। পরে এক ব্যক্তি সে পথে যেতে যেতে সেই কাগজখানা দেখে থমকে দাঁড়ালো। কি চমৎকার অঙ্কন! নানা রঙমোছা সেই কাগজটিতে বৃষ্টির

ফোঁটা পড়ে সেটা এক অতি বিচিত্র রঙিন চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই ব্যক্তি কাগজটি কুড়িয়ে নিয়ে সেটা চিত্র প্রদর্শনীতে এন্ট্রি করালো। এবং যথাসময়ে যা দেখা গেল তা সত্যিই বিস্ময়কর। সেটিই সর্বোত্তম বির্মূত চিত্ররূপে পুরস্কৃত হয়েছে। আষাঢ়ে গল্প নয়? না হেসে পারেন?

ছবি আঁকা নিয়ে এমনি কতো আজগুবি গপ্‌পো আছে তার ইয়ত্তা নেই। আমেরিকার খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী হুইসলারের একটি ল্যান্ডস্কেপ দেখে তাঁর এক গুণমুগ্ধা মহিলা তাঁকে বলেছিলেন, 'জানেন মিস্টার হুইসলার, আপনার আঁকা একটা ল্যান্ডস্কেপ দেখে মনে হচ্ছিল যেন আসল ল্যান্ডস্কেপই দেখছি।'

হুইসলার মৃদু হেসে বললেন, 'হাঁ ম্যাডাম দেখতে পাচ্ছি প্রকৃতি আমাকে অনুকরণ করতে শুরু করেছে এবং সার্থকভাবেই করছে।'

অবশ্যি অহঙ্কারী হুইসলারের এমনি আরও অনেক দম্ভোক্তি আছে যা শুনে বিভিন্ন মহলে অনেক সমালোচনার সঙ্গে বেশ হাসাহাসিও হতো। এখনও হয়। অন্য একজন গুণী শিল্পী প্রদর্শনীতে তাঁর একটি ছবি খুবই প্রশংসিত হয়েছে জানতে পেরে একদিন প্রদর্শনীতে গেলেন। উপস্থিত দর্শকেরা তাঁকে ঘিরে ধরে বলল, 'সকলেই আপনার ছবিটির প্রশংসায় মুখর।'

শিল্পী সবিনয়ে বললেন, 'সকলকে ধন্যবাদ। কিন্তু মাই গড, ছবিটি কি বরাবরই এমনি উল্টো ঝুলে আছে?'

অর্থ সুস্পষ্ট। উল্টো অবস্থাতেই ছবিটি দর্শনীয় ও প্রশংসনীয়। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো নয়। একেই বলে শিল্পকর্মের মূল্যায়ন? নাকি পা দুটো উর্ধে তুলে হাত দিয়ে হাঁটো?

আরও একজন সুপরিচিত শিল্পীর কথা শুনুন। বলা হয়েছে যে, তিনি একদিন এক চিত্র প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁর একটি ছবি দেখে চটেমটে অগ্নিশর্মা। তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন তাঁর ছবিটা আপসাইড ডাউন, মানে উপর দিক নিচে করে ঝুলিয়ে রাখার মানেটা কি? মতলবটা কি? আসলে তাঁর ছবিটা ছিল একটি গোলাকার চক্র। এমন একটি বৃত্তের উপর-নিচ কোথায়?

এবার একটি দুষ্পাঠ্য হস্তলিপির ম্যাজিক খেলা দেখা যাক। হস্তলিপিটির পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছিল না কিছুতেই। অনেকে পড়তে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর একজনের মাথায় একটা আইডিয়া এলো। সে একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে হস্তলিপিটি একজন কমপাউন্ডারকে দেখালো। কমপাউন্ডার সেটা দেখে ওষুধ বানিয়ে দিল এবং সে ওষুধ খেয়ে লোকটার অসুখ সেরে গেল। যত দুষ্পাঠ্যই হোক কমপাউন্ডারেরা যে কোন প্রেসক্রিপশন পাঠে সক্ষম।

এই ম্যাজিক কাহিনী শুনে আরেক জনের আরও উর্বর মাথায় অন্য একটি আইডিয়া ফুটফুট করে উঠলো। সে হস্তলিপিটি নিয়ে গেল এক মিউজিসিয়ানের কাছে। মিউজিসিয়ান এটাকে নোটেশন বা স্বরলিপি রূপে ব্যবহার করে একটি চিত্তগ্রাহী সঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে চমৎকৃত করলো।

এমন সব ভুতুড়ে কাণ্ড মানুষ করতে পারে যা ভূতেরা ধারণাও করতে পারে না। বিমূর্ত শিল্পের নামে মানুষ যেসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে তা দেখে ভূত পালিয়ে বাঁচে। ভূত সরিষাকে কাবু করেছে। কিন্তু বির্মূত শিল্পের সামনে সে নতজানু। অদৃশ্য থাকতে পারে বলেই ভূতেরা আজও টিকে আছে। নইলে মানুষের বজ্জাতির ফলে ভূতের গোটা জাতই কবে বিলুপ্ত হয়ে যেতো। হাঁউ খাউ –এই মন্ত্রোচ্চারণের দিন কবেই শেষ হয়ে গেছে। এখন ভূতের গন্ধ পেলে মানুষের মাতামাতি শুরু হয়। আজকাল মানুষই ভূত-জিনের বাদশা সাজে। অধুনা যতো ভুতুড়ে কাণ্ড ঘটে সে সবই মানুষের করা। আসল ভূতেরা সে সবের ধারেকাছেও থাকে না। ভূতের আসরে ভূত দেখা যায় না। শুধু মানুষের ভিড়। ওঝারা ভূত তাড়িয়ে নিজেরা ভূতের সর্দারী করে। রঙ্গভরা বঙ্গদেশে নতুন রঙ্গের আমদানি হয়েছে। ভৌতিক রঙ্গ।...

এখন আর একটি পুরনো উক্তি বলে এবারের পালা শেষ করছি। তবে এটি প্রথমটির মতো সম্পূর্ণ সত্য নয়। উক্তিটি হচ্ছে–ইজি কাম ইজি গো। Easy come easy go. সহজে আসে সহজে যায়। অতিথি সহজে আসেন বটে; কিন্তু সহজে যান কি?

ইন্টিকুলুস-টু

ফারুক নওয়াজ

ওরে বেটা জজ মিয়া বিড়ি খাবি, খা!
বিরিয়ানি, পান্তুয়া-ফ্রি খাবি, খা!
যেটা চাবি সেটা পাবি, খেয়ে খাবি জল;
বলি সেটা সেইমতো তুই শুধু বল!
এতো দিন ধরে তোকে যেটা শেখালাম
আদালতে গিয়ে বল্ সেইসব নাম!
বল্ বেটা, 'ককটেল মেরেছিল রাম।'
বল্, 'আমি জিপিওতে দাঁড়িয়ে ছিলাম।'
ওরে বেটা জজ মিয়া সামনেই ভোট–
জিতে গেলে দেবো তোকে কচকচে নোট।
দেবো আরো গাড়ি-বাড়ি
সোনাদানা কাঁড়াকাঁড়ি
লাল ভিসা পেয়ে যাবি হলে প্রয়োজন–
ফুট করে পাড়ি দিবি ওয়াশিংটন।
ওরে ওরে জজ মিয়া ভালো ছেলে তুই–
আদরের ধন তোকে কোন্‌খানে থুই?
ফোর পাস হাবাগোবা তোর মতো ছেলে–
যেহেতু পেয়েছি তোকে পাঠাবো না জেলে।
জামাই আদরে থাক্
নরম চাদরে থাক্
শুধু তুই কথা রাখ্; পাবি ঠিকই ফল;
কোর্টে গিয়ে আষাঢ়ের গল্পটা বল্।
বল্ বেটা, 'করিমালি মেরেছিলো বোম
তার সাথে আরো ছিলো হরিপদ সোম
মুগদার আবু ছিলো
তেজগাঁর বাবু ছিলো
ককটেল ছুঁড়ে ওরা গিয়েছিলো রোম।'
বল্ বেটা জজ মিয়া কোনো ভয় নাই–
কিনে দেবো কোট-প্যান্ট, খান্দানি টাই!
তেড়িবেড়ি করবি তো–
জেলে পচে মরবি তো!
তোর নামে করে দেবো ইনজাংশান;
বল্, 'বোমা মেরেছিলো বড়ো ভাইজান!'
বল্, তুই সাথে ছিলি দেখেছিলি সব,
তোর হাতে ককটেল দিয়েছিলো রব
ভয় পেয়ে ককটেল ফেলে দিলি ছুট–
এক ছুটে ঘরে গিয়ে খেয়েছিলি বুট।
বল্ বেটা জজ মিয়া, 'মঞ্চেরই লোক–
বোমা মেরে বোমা খেয়ে করেছিলো শোক!'
বলে যাবি গল্পই–তবে গল্প না!–
'এইসব তাহাদেরি পরিকল্পনা!'
বল্ বেটা জজ মিয়া কৃষকের পুত্
ভুল হলে থাপ্পড়ে করে দেবো ভূত!
নির্ভয়ে বলে যাবি

বলে সোজা চলে যাবি
গিয়ে বিরিয়ানি খাবি
সামনেই ভোট;
সাকসেস হলে পাবি কচকচে নোট!
টাকা পাবি, আরো পাবি এটা-ওটা হাবিজাবি
খেতে চেলে দেবো ঢেলে
আঙুরের জুস;
চোখ বুজে যাবি বলে
তবে বেটা ভুল হলে
সবকিছু হয়ে যাবে ইন্টিকুলুস!

দু'টি প্রশ্ন

সাযযাদ কাদির

এক কালে এক রাজা ছিলেন তোরোজা রাজ্যে। একদিন তিনি গেলেন এক বিশাল দিঘিতে স্নান করতে। সেই দিঘির জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, আর তাতে ভেসে বেড়ায় কত রঙের কত রকমের ফুল!

স্নানের জন্য দিঘিতে নামার আগে ঘাটের কাছে এক পাথরের পাশে রাজা আঙুল থেকে খুলে রাখেন তাঁর হীরা-জহরতের আংটি। দূর থেকে এক বালক দেখেছিল সবকিছু। রাজা যখন স্নানে মগ্ন তখন সে পা টিপে টিপে এসে চুরি করে নিয়ে যায় সেই আংটি।

আংটি হারিয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়েন রাজা। চারপাশে লোক লাগিয়ে দেন চোর ধরতে, আর পুরস্কারও ঘোষণা করেন অনেক। সেই ঘোষণা শুনে বালক একদিন হাজির হয় রাজার সামনে, কুর্নিশ করে বলে, হুজুর! আংটি আমি খুঁজে পেয়েছি।

খুশি হয়ে রাজা অনেক পুরস্কার দেন তাকে, দামী-দামী জামাকাপড় দেন পরতে, আর পেট ভরে খাইয়ে দেন শাহী খাবার।

কিছুদিন পর এক জাহাজ নোঙর বাঁধে তোরোজা রাজ্যের বন্দরে। ওই জাহাজের প্রধান নাবিক দু'টি হাঁস আর এক টুকরা কালো কাঠ নিয়ে হাজির হয় রাজার সামনে, বলে– হুজুর, এই দু'টি হাঁসের কোন্‌টা মর্দা কোন্‌টা মাদী, আর এই কালো কাঠের কোন্ দিক উপর, কোন্ দিক নিচ–যদি এই রাজ্যের কেউ তা বলতে পারে তবে আমার জাহাজ আমি উপহার দেবো আপনাকে!

শুনে মাথা চুলকান রাজা, তারপর ডেকে পাঠান সেই বালককে, বলেন– তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি তুমি হারানো আংটি খুঁজে পাও– এখন নাবিকের দু'টি প্রশ্নের উত্তর দাও দেখি! না দিতে পারলে গর্দান যাবে তোমার–হ্যাঁ!

সবকিছু দেখেশুনে মাথা ঘুলিয়ে যায় বালকের, শেষে কয়েক দিন সময় চায় রাজার কাছে। রাজা বলেন, ঠিক আছে– সময় দিলাম সাত দিন!

সাত দিন ধরে মাথা কুটে মরে বালক, কিন্তু কোন বুদ্ধিই আসে না মাথায়। শেষে ভাবে–আমার আর বেঁচে থেকে কি লাভ– আমি বরং সাগরে ডুবেই মরি!

এই ভেবে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাগরে, তারপর নাকানি চুবানি খেয়ে ডুবতে-ডুবতে সংজ্ঞা হারায় এক সময়। যখন সংজ্ঞা ফেরে তখন দেখে সে শুয়ে আছে জাহাজে, চারপাশে হল্লাচিল্লা করছে নাবিকরা। বুঝতে পারে, ওরাই তাকে তুলে এনেছে সাগর থেকে।

নানা কথা বলাবলি করছিল নাবিকরা, সে সব কথায় কান পাতে বালক। শোনে এক নাবিক বলছে, আমাদের প্রধান নাবিক গেলেন কোথায়?

আরেক নাবিক বলে, রাজার কাছে। গেছেন সেই হাঁস দু'টি আর কাঠের টুকরা নিয়ে।

অন্য নাবিক হাসে, বুঝেছি– সেই দু'টি প্রশ্নের ব্যাপার তো? এত সোজা প্রশ্ন, কিন্তু রাজার ঘটে বুদ্ধি নেই। থাকলে মুখের ওপর বলে দিতেন....

এরপর অনেক কথা। সে সব শুনে লাফিয়ে ওঠে বালক, তারপর জাহাজ থেকে নেমে এক ছুটে চলে যায় রাজার কাছে, বলে– প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি। এখন হাঁস দু'টিকে ছেড়ে দিন দিঘির দিকে–

কথামতো নাবিক ছেড়ে দেয় দু'টি হাঁস। দিঘির কাছে গিয়ে আগে একটি হাঁস জলে নামে, তাকে অনুসরণ করে নামে অন্য হাঁসটি। বালক বলে, প্রথমে যে হাঁসটি জলে নেমেছে সেটি মদ্দা, পরে নেমেছে মাদী।

প্রধান নাবিক বলে, ঠিক। মর্দা ও মাদী হাঁসের মধ্যে মর্দা-ই আগে জলে নামে।

এরপর বালক কালো কাঠের টুকরাটিকে ভাসাতে বলে জলে। টুকরার একটা দিক ডুবে যায় কিছুটা, অন্যদিকে ভেসে থাকে। বালক বলে, কাঠের উপর দিক ভেসে আছে– নিচের দিক ডুবে গেছে!

নাবিক বলে, ঠিক কথা!

প্রশ্নের উত্তর সঠিক হওয়ায় খুশিতে আত্মহারা হন রাজা– ভাবেন– বালকের মাথায় কত বুদ্ধি! ওই খুশির চোটেই তিনি ঘোষণা করে বসেন, এই বালকই আমার উত্তরাধিকারী!

ইন্দোনেশিয়ার লোককাহিনী

উপহার বিষয়ক জটিলতা

জাফর তালুকদার

মামার কাঁইকুঁই সহ্য করতে না পেরে মা শেষ পর্যন্ত একজন ওঝা ডেকে আনলেন। মামা চিৎ হয়ে সোজা শুয়ে আছেন খাটের ওপর। কোমর ব্যথার তাণ্ডব পুরোপুরি কাত করে ফেলেছে তাকে। ডাক্তারী ওষুধ গিলতে মামার বেজায় আপত্তি। অনেক বলেকয়ে দু'একটা ওষুধ গেলানোর ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু তা নিয়েও নানা প্রশ্ন।

'মেজ বু, এভাবে চোখ-কান বন্ধ করে পেইন কিলার খাওয়া ঠিক নয়। এর অনেক সাইড-এ্যাফেক্ট আছে। আমাদের শাহাবুদ্দীনকে চেনো তো, একবার হলো কী...।'

'রাখ তোর শাহাবুদ্দীন, তুই খাবি কিনা তাই বল?' মা বিরক্তির চোখে তাকালেন মামার দিকে।

'আহা, রাগছ কেন, তুমি যখন বলছ অবশ্যই খাব, তা এক্সপায়ারি ডেট আছে তো?'

'তোর যখন এতো সন্দেহ, তাহলে চল একজন হোমিওপ্যাথের কাছে যাই।'

'ওদের কাছে কোমর ব্যথার ওষুধ আছে?'

'থাকবে না কেন, আলবত আছে।'

'কিন্তু আমি যে শুনেছি ওদের ওষুধ খেয়ে রোগী ভাল হতে হতে অক্কা পায়।'

'বাজে বকিস না। তুই যাবি কিনা তাই বল। না যাস তো, গাছ-কোমর হয়ে পড়ে থাক বিছানায়। আমি এসবের মধ্যে নেই।'

বাবা চা খেতে খেতে পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলেন। হঠাৎ ফিচিক হেসে ফোঁড়ন কাটলেন, 'রানু, ওকে বরং একজন ভস্ম-সাধুর কাছে নিয়ে যাও। গায়ে ছাই-কাদা মেখে রোদে চিৎ করে রাখুক কয়েকদিন। তাতেই কাজ হবে।'

সাধু নয়, বরং একজন ওঝা ডেকে মামাকে চিকিৎসা করানোর সিদ্ধান্ত হলো শেষ পর্যন্ত।

ওঝা দেখে নিরাশ হলাম আমরা। প্রথমে ভেবেছিলাম কাপালিক টাপালিকের মতন কোন ব্যাপার। সিনেমা টিনেমায় যেমনটি হয়– বিশাল আলখেল্লা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, ইয়া লম্বা গোঁফ দাড়ি আর জটাজুটোর চূড়া থাকবে লাল সালুতে বাঁধা। হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকে হুংকার দেবে– হক মাওলা।

না, সে রকম কোন আওয়াজ পাওয়া গেল না। লোকটা নেহায়েতই সাধারণ। মামার শিয়রে বসে হাতের তালু পর্যবেক্ষণ করলেন গম্ভীর ভঙ্গিতে। তারপর গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'বাতাস, আপনার দেহে আউলা বাতাস লাগছে।'

মামা অবাক হয়ে বললেন, 'বাতাস, বাতাস লেগেছে তো কী হয়েছে!'

মামার আনাড়িপনায় যারপরনাই বিরক্ত হলো লোকটা, 'বাতাস বোঝেন না, কু-বাতাস। এই বাতাসে বদবিষ অইছে শরীরে। এই বিষ বাইর করতে অইবে।'

বাতাস আর বদবিষের মাথামুণ্ডু না বুঝে বিরস মুখে খেলতে চলে গেল ছোট বোন টুম্পা। কাজের মেয়ে পরী উঁকিঝুঁকি মারছিল দরজার আড়াল থেকে। হঠাৎ কী মনে করে দৌড়ে গেল মায়ের কাছে, 'খালাম্মা, অ খালাম্মা, মামার প্যাডে বদবিষ অইছে।'

'বদবিষ মানে?'

'হেয়া মুই জানি! ওঝায় কইছে।'

'আচ্ছা, চলতো শুনি।'

রোগী কু-বাতাসে ভীত না হয়ে ওঝার জাতকুল-ঠিকুজি পরীক্ষা শুরু করল। মা এসে পড়ায় বেচারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল, 'মাজান, রোগীর কেইস বড়ই খারাপ। কু-বাতাসের আছর। কোমরের কোনায় কোনায় বদ-বিষ।'

'তা এখন কী করতে হবে?'
'কিছু অনুপানের কতা কইতেছি। কেজিটাক সরিষার তৈল, দেড়পো খোলা নুন, প্যাকেট অইলে অবে না, আর লাগবে তিনডা দেশী মাগুর, এগুলান পইড়া দেবার পর রোগীরে খাওয়াইবেন।'
বাবা পত্রিকা সরিয়ে প্রবল অট্টহাস্যে বললেন, 'ওঝা সাহেব, মাছগুলো কী উনি লবণ দিয়ে কাঁচা খাবেন?'
'নওজুবিল্লাহ, উনি কী পশুপাখি নাকি কাঁচা মাছ খাবেন।'
এ ধরনের কথাবার্তায় মা স্পষ্টত বিরক্ত। চাপা স্বরে বললেন, 'আর কী করতে হবে?'
'আর একটা ছাগল লাগবে মাজান। পুরা কালা রঙের।' ওঝা সাহেব চোখ বন্ধ করে ছাগলের বর্ণনা দিলেন।
বাবা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'এ্যাবসলুট্‌লি ব্ল্যাক! কেন হোয়াইট হলে হবে না? শিং কিংবা দাড়ি থাকলে ক্ষতি নেই তো?'
মা মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, 'আহা, কী শুরু করলে? আগে সব শুনতে তো দেবে। তা ওঝা সাহেব, এবার বলেন কালো ছাগল দিয়ে কী হবে?'
'গরিব-মিসকিনেরে খাওয়াইয়া দেবেন।'
'কেন, আপনি খাবেন না?' মামা কোমর ঘুরোতে গিয়ে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলেন।
'না-ভাই সাব, রোগীর বাড়ি পানি খাওনও ওনার নিষেধ আছে।' ওঝা নিজের ঘাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে কোন অশরীরী আত্মার কথা বোঝানোর চেষ্টা করল।
'আচ্ছা ঠিক আছে, এবার বলেন, আর কী লাগবে?' মামার চোখ কৌতূহলে নেচে উঠল।
'আর একটা সপ্তধাতুর মাদুলি লাগবে কোমরে পরনের জন্যে। একটা কাঁচা নারিকেল পাতার শলা আনার ব্যবস্থা করেন। রোগীর ডাইন হাতের কইড়া আঙুলের মাপ লইতে অইবে।'
'সপ্তধাতু কোথায় পাওয়া যাবে?' মার মুখে হতাশা ফুটে উঠল।
'এইডা খোব ঝামেলার বেষয়। অর্ডার কইরা ইস্পিস্যাল বানাইতে অয় চেনা লোক দিয়া। দাম ১৪০ টাকা। এখন আপনাগো মর্জি।' ওঝা আলগা গলায় কথাটা বলে উঠে দাঁড়াল।
'বেশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি। আপনি অর্ডার দিয়ে মাদুলি বানিয়ে নেবেন। এখন বলেন, আপনার ফী কত দিতে হবে?'
'তওবা, তওবা, আমাগো তো ফী নেওনের বিধান নাই। তয় খুশি অইয়া একটা মোবাইল উপহার দিলে গেরামে ওয়াইফের লগে এট্টু কথা কইতে পারতাম।'
বাবা মুচকি হেসে বললেন, 'বুঝেছি, মাংসে অরুচি, ঝোল জায়েজ। তা আপনিও তো দেখছি খুঁড়িয়ে হাঁটেন। কোমর ব্যথা নাকি? তাহলে মোবাইল কেন? আপনার বরং একখানা ব্যাম্বু-স্টিক দরকার। ব্যাম্বু চেনেন তো, বেশ পাকা দেখে, গিঁটঅলা, তেলতেলে...।'
মা ততক্ষণে উঠে চলে গেছেন।
বাঁশের ব্যবহার বহুবিধ। সেটা যথার্থভাবে কী উপায়ে প্রয়োগ করা যায়, সেটাই এখন দ্রুত ঘুরপাক খাচ্ছিল মামার মাথায়।

নদী ঘুমিয়েছে

শা ম সু জ্জা মা ন খা ন

এক সাদাসিধে গুরু আর তার বারোজন শিষ্য। তারা বেরিয়েছে তীর্থযাত্রা করতে। পথে পড়ল এক নদী। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এক শিষ্য নদী পার হতে যাচ্ছিল। গুরু বলেন : ওরে, নির্বোধ, রাতের বেলা না বুঝেশুনে এভাবে নদী পার হতে নেই। নদীরা হলো চিররহস্যের আধার। কোন্ নদীর কী স্বভাব-চরিত্র তা না জেনে অমন করে নদীতে নামতে নেই। শুনেছি, এ নদী, বড় তেজী, সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে। আবার দৈত্যদানোর মতো ধোঁয়া ছেড়ে উথালপাতাল করে নিজের পাড় ভেঙ্গে গাছপালা, বাড়িঘর, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি সব নিজের গর্ভে নিয়ে তবেই খানিক শান্ত হয়। এভাবে এ নদী কত জনপদ, মানুষজনকে খেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আগে একজন যেয়ে দেখে আস : নদী শান্ত কিনা! না ভাংচুর করছে। এক শিষ্য একখণ্ড শুকনো কাঠের মাথায় আগুন ধরিয়ে যায় নদীতীরে। সে দেখবে, নদী শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে, না ক্রোধে ফোঁস ফোঁস করে পাড় ভেঙ্গে ক্ষেতের ফসল, গাছপালা আর বাড়িঘর পেটের ভেতরে নিচ্ছে।
নদীতীরে গিয়ে শিষ্য দেখে, না নদী শীতল পাটির মতো বিছানো অবস্থায় ঘুমুচ্ছে। শিষ্য ছিল সাবধানী। ভাবল : এ নদী রাক্ষুসে। এ কোন মক্কর, কে জানে! হয়ত ঘুমোয়নি, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। হয়ত আমাদের দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে নেবে সেজন্যই এমন ভাল মানুষ সেজেছে।
তাই সে পরীক্ষা করার জন্য তার হাতের আগুন ধরানো চেলা কাঠ দিয়ে নদীকে খোঁচা মারে। আগুন ধরানো অংশ পানিতে ডোবাতেই ফোঁস ফোঁস শব্দ হয়, আর বের হয় ধোঁয়া। শিষ্য ভয়ে দৌড়ে পালায় চেলা কাঠ নিয়ে। হাঁফাতে হাঁফাতে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলে : প্রভু, এ বড়ো নচ্ছার নদী। আমাদের খাবার মতলবে সটকা মেরে পড়ে আছে। যেই আগুনে চেলা ডোবালাম, অমনি গোখরো সাপের মতো ফোঁস ফোঁস করে উঠল। আর ধোঁয়াও ছাড়ল। ভাগ্যিস পাড়ের মাটি ভেঙ্গে আমাকে গিলে খায়নি।
তখন গুরু বলে : তাহলে বিশ্রাম করা যাক। নদী ঘুমালে তবেই পার হব। তো, আগুন জ্বেলে বসে, বিশ্রাম করছে গুরু-শিষ্যের দল।
গুরু বলে : এই নদী যে ভয়ঙ্কর আর রাক্ষুসে তা আমি জানি কেমনে সে কথাই তোমাদের বলি। সে আমার ঠাকুরদার আমলের ঘটনা। একবার তিনি দুটো গাধার পিঠে চার বস্তা চিনি চাপিয়ে নদী পার হচ্ছিলেন। ওরা তো ভেজা কাপড়ে হাতে শুকনো কাপড় নিয়ে হাত উঁচু করে সাঁতরে নদী পার হলেন। গাধা দুটোও পার হলো। হারাম! নদীর অপর পাড়ে গিয়ে দেখে আমার ঠাকুরদার পরা কাপড় ভিজেছে। তবে হাত উঁচু করে রেখেছিলেন বলে, হাতের শুকনো কাপড়ও ঠিকই আছে। ভেজা কাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরে গাধার কাছে গিয়ে তো তিনি তাজ্জব। আরে চিনি কই? বস্তা তেমনি টাইট করে বাধা। কোন ফুটাফাটা নেই। শুধু মরা ছাগল নদীতে যখন ভেসে যায় তখন তার ফোলা পেটের মতো বস্তাগুলো আর ফোলা নেই। বস্তাগুলো চুপসে গেছে। তোমরা বুঝলে ব্যাপারখানা। চিনি তো। অমন মিষ্টি জিনিসে দেবতারও মন টলে। আর নদী দেবতা বা দেবী যাই হোক, তারও লোভ সামলানো সম্ভব হয়নি। চার বস্তা চিনিই খেয়ে সাবাড় করে দিয়েছে। এ নদী চোর, ডাকাত, সাপের মতো যাকে ইচ্ছে ছোবল মারে, দৈত্যের মতো লোকালয় নিশ্চিহ্ন করে। তাই নদী যখন ঘুমায়নি, ফোঁস ফোঁস করছে তখন আর একে বিশ্বাস নেই। চল আজ গাছতলায় যাত্রাবিরতি। কাল দিনের বেলায় দেখা যাবে।
পর দিন সকালে সেই শিষ্য রাতের চেলা কাঠখানা নিয়ে আবার দেখতে যায় : নদী রাতে তো জেগে ছিল,—এখন ঘুমিয়েছে কিনা। দিনের বেলা। তাই রাতের আগুনসুদ্ধ নদীতে ডোবানো চেলার মাথায় আর আগুন জ্বালায়নি। চেলার পোড়া মাথাটা ভিজাই আছে। সেই চেলা কাঠের মাথা দিয়ে শিষ্য নদীকে খোঁচা মারে। নদী ফোঁস করে না। ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য আবার খোঁচায়— না, নদী চুপ। গভীর ঘুমে মগ্ন। শেষবার পরীক্ষা। এবার বাড়ি মারে পানিতে। তাও ফোঁস নেই, ফাঁস লাপাত্তা, ধোঁয়া উধাও।
খুশিতে ঝিলিক মেরে ওঠে শিষ্যের মন। গুরু খুশি— খুশি তার সব শিষ্য। নির্ভয়ে তারা পার হয় নদী।

সাত সরেরো

গ্রীন বিল্ডিং

ফ য় সা ল মা হ মু দ রু মি

৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিউজার্সির আকাশসীমায় কোলগেট ফ্যাক্টরি এক পরিচিত মুখ বলে সমাদৃত ছিল। আর এর কারণ হলো ৩০ ফুট (৯ মিটার) উচ্চতাবিশিষ্ট অষ্টভুজ ঘড়িটি, যা বহু মাইল দূর থেকে দেখা যেত। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই পুরনো চেহারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আর তারই ধারাবাহিকতায় বিখ্যাত সেই ঘড়িটি এখন স্থান পাচ্ছে ৬৫০ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত নব কাঠামোতে যা গোল্ডম্যান স্যাশ্‌স কমপ্লেক্স নামে পরিচিত। এই ফার্মের লক্ষ্য ছিল পুরো এলাকাটিকে এমনভাবে তৈরি করা, যা ডাউনটাউন ম্যানহাটনের অপর কাঠামোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে। আবার ম্যানহাটনের কমপ্লেক্সে কোন আকর্ষণীয়, কার্যকরী এবং উপযোগী প্রাকৃতিক পরিবেশের সমন্বয় না ঘটলেও বর্তমান প্রকল্পটিতে এগুলোর সব যাতে বজায় থাকে সেদিকটার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। ৬০০০ লোক কাজ করতে পারে এমন কার্যালয়, ১৬০ রুমের থাকার ঘর, বিপণিকেন্দ্র ইত্যাদির ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন করে পুরো ক্যাম্পাসটির ডিজাইন করা হয়েছে।
কমপ্লেক্সটিতে ৪২ তলা একটি ভবন যা ১.৫ মিলিয়ন বর্গফুটের (১,৩৯,৩৫০ বর্গমিটার) অফিস টাওয়ার হিসাবে ব্যবহারের জন্য এবং ৫ লাখ বর্গফুটের (৪৬,৪৫০ বর্গমিটার) ১৫ তলাসম্পন্ন একটি বিবিধ কাজের সুযোগপূর্ণ ভবন আছে। এই দুই ভবন সংযোগের জন্য ১৩৫ ফুট (৪১ মিটার) উঁচু কাঁচের দালান তৈরি করা হয়েছে, যা ২৫,০০০ বর্গফুট বা ২,৩২৩ বর্গমিটার উচ্চতাসম্পন্ন। এই বিশেষ সংযোগ দালানটিকে 'ট্যারেসেস' বলে আর এটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এর বৈশিষ্ট্য হলো, এতে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে নিয়ন্ত্রিত

পরিবেশ ব্যবস্থা বিরাজ করবে, যেখান থেকে ম্যানহাটন সহজেই দেখা যাবে। কমপ্লেক্সের নিচে চার স্তরবিশিষ্ট কার পার্কিং একসঙ্গে ১৪০০ গাড়ি সঙ্কুলান করবে।

ভবনের নির্মাণশৈলীর অন্যতম দিক হলো এটির প্রায় পুরো অংশই কাঁচের আচ্ছাদনে ঢাকা, সেই সঙ্গে আছে পাথর এবং ধাতব নক্সার সমন্বয়। আর এর ফলে নতুন যে মাত্রা যোগ হয়েছে তা হলো সম্মুখস্থ একটি কৌণিক অবয়ব, যা ভবনটিকে বড় একটি ফাঁকা স্থান হিসাবে তুলে ধরে।

এবার আসা যাক 'গ্রীন বিল্ডিং' বৈশিষ্ট্যের অংশে। নাম থেকেই কিছুটা ধারণা পাওয়া যায় যে, এতে 'সবুজের সমারোহ' এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলোই প্রাধান্য পাবে। আর বলতে গেলে এই রকম ধারণা এ জাতীয় দালানে প্রয়োগ করা প্রথম এবং অনন্য। এই নবরূপের বাস্তবিক প্রয়োগের জন্য নক্সা প্রণয়নকারী দলকে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির গ্রীন বিল্ডিং কাউন্সিল প্রণীত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হয়েছে। এই নিয়মগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–অবকাঠামো এবং দালানের যাবতীয় উপকরণ এবং উপাদান এমন রেটিংয়ের মধ্যে থাকতে হবে যাতে সেগুলো রূপান্তরিত রূপে ব্যবহার করা যায়, শক্তির সর্বনিম্ন অপচয় এবং পরিবেশবান্ধব হয় ইত্যাদি। এ ছাড়াও গবেষণায় দেখা গেছে, যে দালানে ব্যবহৃত বিভিন্ন জাতীয় কাঁচে আলো প্রতিফলিত হয়ে নানা জাতের পাখির ওড়ায় সাধারণ মাত্রায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, ফলে এদিক থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘিত হয়। আর বর্তমানে অধিকাংশ দালানে কাঁচসামগ্রীর বহুল ব্যবহার এর মাত্রাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। তাই 'গ্রীন বিল্ডিং' উপমাকে সত্যিকারভাবে কার্যকর করতে এই প্রকল্পে কাঁচসামগ্রীকে এমন রেটিং অর্জন করতে হয়েছে, যা আলো এবং দৃষ্টির পথে অন্তরায় না হয়। সব ধরনের দালানে গাছপালার বেঁচে থাকার জন্য প্রধান অন্তরায় হলো আলো-বাতাস। আর গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধির জন্য যতটুকু স্থানের প্রয়োজন তা অধিকাংশ দালানই নিশ্চিত করতে পারে না। কিন্তু ট্যারেসেস ঘেরা এই প্রকল্পে এ জাতীয় সব প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করা হয়েছে। প্রথমত, আলোর পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে বিশেষ মাত্রার কাঁচ ব্যবহার করে। আর এই কাঁচ অনেকটা গ্রীন হাউস সিস্টেমের মতোই এখানে কার্যকর করা হয়েছে। ট্যারেসেসের ভিতর সর্বসাধারণের উপস্থিতি সত্ত্বেও যাতে 'সাফোকেশন' তথা স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন সমস্যা না হয় তার জন্য ব্যাপক এবং প্রযুক্তিগত ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পুরো কমপ্লেক্সটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হলেও সূর্যরশ্মিকে কাঁচ প্যানেলের মাধ্যমে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে গাছপালার স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা বাধাহীন থাকে। আর গাছের সর্বোচ্চ উচ্চতাকে আদর্শ ধরে কলামগুলোকে কাঁচ প্যানেলের সঙ্গে বিশেষ ট্রাস ব্যবস্থায় সংযুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে আপনি যখন সেই ট্যারেসেসের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবেন তখন আপনার মনেই হবে না কোন দালানের মধ্যে আছেন। গাছ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের এমন সমন্বয় আপনাকে অনুভব করতে বাধ্য করবে যে, আপনি একটি উন্মুক্ত পার্ক বা এ জাতীয় কোন খোলামেলা স্থানে আছেন। সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে, আপনি দেখবেন পাখি গাছে বসে কিচিরমিচির করছে অথবা মুক্তভাবে উড়ে বেড়াচ্ছে অথচ সম্পূর্ণ ক্যাম্পাসটাই একটি দালানের ভিতরের অংশ।

স্বাভাবিক জীবনযাপন আর কংক্রীট ইট-পাথরের দালান বরাবরই বিরোধী হলেও এমন অনন্য প্রকল্প বর্তমান বিশ্বের যান্ত্রিক নগরায়নে সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। আর তাই এখন অনেকেই এমন পরিবেশবান্ধব দালানের চিন্তাভাবনা করছেন, যাতে আগামী প্রজন্ম কোন ভয়াবহ প্রাকৃতিক বৈরিতার সম্মুখীন না হয়।

নিলামে আমেরিকার প্রথম ম্যাপ

আমেরিকার প্রথম মানচিত্রটি এবার নিলামে উঠল। লন্ডনের এক অক্শনে মানচিত্রটি বিক্রি হয়ে গেল প্রায় এক মিলিয়ন ডলারে। চার্লস ফ্রডশন নামক একজন লন্ডন বুক ডিলার ৫৪৫,৬০০ পাউন্ডে ম্যাপটির স্বত্ব লাভ করেছেন। নিলাম অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনের ক্রিস্টিতে। জানা গেছে, এই ম্যাপটিতেই সর্বপ্রথম পৃথিবীকে গোলাকারভাবে মুদ্রণ করা হয়েছিল। এর দ্বারাই প্রথম উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে ভাগ করে দেখানো হয়েছে এবং প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা এ মানচিত্র থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। অবশ্য এই প্রথম মানচিত্রকে দেখানো হয়েছে ইউরোপের পশ্চিমে অবস্থিত নব আবিষ্কৃত মহাদেশ হিসাবে।

মানচিত্রটি ১৫০৭ সালে মুদ্রণ করেছিলেন একজন জার্মান জিওগ্রাফার মার্টিন ওয়ালড সিমুলার। আমেরিকার সবচেয়ে প্রাচীন মানচিত্রগুলোর মধ্যে এটি একটি। নিলামে আশা করা হয়েছিল মানচিত্রটির দাম ৫০০০০০ থেকে ৮০০০০০ পাউন্ডের মধ্যে ওঠানামা করবে। এই নিলাম হাউসের পরিচালক টম ল্যাম্ব বলেছেন, "আমার জীবনে এ সবচাইতে আকর্ষণীয় অভিজ্ঞতা। ম্যাপটি আবিষ্কারের পর যারপরনাই আমি আনন্দিত হয়েছি। এই ম্যাপটি ম্যাপ তৈরির প্রাচীন ইতিহাসকে সরাসরি নির্দেশ করছে। এই সাধারণ কাগজের টুকরোটি বহন করছে অনেক নতুন ও অজানা আবিষ্কারের পথ।

বেশিরভাগ ঐতিহাসিক কাগজপত্রের প্রণেতা হিসাবে সর্বপ্রথমেই নাম আসে ক্রিস্টোফার কলম্বাসের। তিনিই প্রথম আমেরিকান, যিনি ১৪৯২ সালে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তিনি অবশ্য প্রথমে ভেবেছিলেন এটি এশিয়ার একটি অংশ। পরে তাঁর সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়। আরেক ইতালিয়ান আমেরিগো ভেসপুচি মনে করেছিলেন, ইউরোপের পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল ভূখণ্ড একটি নতুন মহাদেশ। মানচিত্র অঙ্কনকালে পৃথিবীর আকার-আকৃতিকে দেখানো হতো মূলত প্রাচীন গ্রীকদের দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞানানুসারে। কিন্তু ১৫০৫ সালে লরেনের ডিউক দ্বিতীয় রেনে একদল গবেষককে নির্দেশ দেন একটি নতুন পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কনের জন্য। গবেষক দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন মার্টিন ওয়ালড সিমুলার। তিনি ভেসপুচির ভ্রমণযাত্রাটিকে ফ্রেঞ্চ ভাষায় অনূদিত করেন, যার ফলশ্রুতিতে গবেষকরা এই নতুন ভূখণ্ডটিকে 'আমেরিকা' নাম দেন আমেরিগো ভেসপুচির নাম অনুসারে। ওয়ালড সিমুলারের আসল ম্যাপের একটি নমুনা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৭১ সালে এবং এটিকে সংরক্ষণ করে রাখা হয় আমেরিকার মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর আরেকটি বৃহৎ সংস্করণ ওয়াশিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরী ২০০৩ সালে কিনেছিল ১০ মিলিয়ন ডলারে।

তাহমিনা জাহান

হামিং বার্ডের ওড়া

বিশ্বের সবচাইতে ছোট পাখি হামিং বার্ড। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এই ছোট পাখিটি কীটপতঙ্গের মতো করে ওড়ে। কিন্তু এই কথা মানতে পারেননি ওরিগন স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। তাই তাঁরা হামিং বার্ডের ওড়ার পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। এজন্য তাঁরা ডিজিটাল পার্টিকেল ইমেজিং ভেলোমেট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা দেখেন যে, এই হামিং বার্ড তাদের ওড়ার পঁচিশ ভাগ শক্তি পায় ওপর দিকে ডানা ঝাপটানোর কারণে এবং বাকি পঁচাত্তর ভাগ পায় নিচের দিকে ঝাপটানোতে। আর কীটপতঙ্গ পঞ্চাশ ভাগ ওপর-নিচে ডানা ঝাপটিয়ে ওড়ার শক্তি পেয়ে থাকে এবং অন্য পাখির বেশিরভাগই নিচের দিকে ডানা ঝাপটিয়ে এ শক্তিটি পায়। এ থেকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে, হামিং বার্ডের ওড়ার পদ্ধতি পাখি এবং কীটপতঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত।

মারুফ হাসান

মার্ক টোয়েনের দুঃস্বপ্ন

স্যামুয়েল ক্লেমেন্স (মার্ক টোয়েন) তখন পেনসিলভেনিয়া জাহাজে স্টিয়ার্সম্যানের কাজ করতেন। পেনসিলভেনিয়া নোঙ্গর ফেলেছে সেন্ট লুই বন্দরে। সে রাতে তিনি ছিলেন বোনের বাসায়। রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলেন : বসার ঘরে ধাতুনির্মিত একটা কফিনে শুয়ে আছে ছোট ভাই হেনরির লাশ। বুকের ওপর রাখা আছে ধবধবে সাদা একগুচ্ছ ফুলের তোড়া, তার ঠিক মাঝখানে দেখা যাচ্ছে গাঢ় লাল একটা ফুল।

স্বপ্নটা এতই জীবন্ত ছিল যে, ঘুম ভাঙ্গার পরও স্যামুয়েলের তথা মার্ক টোয়েনের ঘোর কাটল না। মৃত ভাইকে দেখার জন্য দ্রুত পোশাক পাল্টে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে এলেন। বেশ কিছুদূর হেঁটে যাবার পর ঘোর কাটল, মনে পড়ল, সবই স্বপ্ন। বাড়ি ফিরে বোনকে স্বপ্নের কথাটা বললেন। তারপর দু'জনেই পুরো বিষয়টা ভুলে গেলেন।

হেনরিও স্যামুয়েলের সঙ্গে পেনসিলভেনিয়া জাহাজে কাজ করতেন। একই সঙ্গে দু'ভাই সেন্ট লুই ছেড়ে নিউ অরলিয়েন্সে পৌঁছলেন জাহাজের সঙ্গে। এখানে স্যামুয়েলকে বদলি করে দেয়া হলো এটি ল্যাসি নামের আরেকটা জাহাজে। মেমফিসের কাছে পেনসিলভেনিয়া বিস্ফোরিত হলো। খবর পেয়ে স্যামুয়েল যত দ্রুত সম্ভব মেমফিসের হাসপাতালে পৌঁছলেন। গুরুতর আহত অন্য ত্রিশজনের সঙ্গে হেনরিরও চিকিৎসা চলছে। কিন্তু ডাক্তার আশা দিতে পারলেন না। দুর্ঘটনার ছ'রাত পর মারা গেলেন হেনরি।

হেনরিকে 'ডেড রুম'-এ নিয়ে যাওয়া হলো। গত ক'দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লেন স্যামুয়েল। ভাইয়ের মৃত্যু যেন তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। দুর্বল শরীরে নিজের অজান্তেই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পর ঘুম ভাঙল। দৌড়ে চলে গেলেন ডেড রুমে হেনরিকে দেখতে। সারি সারি রাখা হয়েছে কফিন। সব কফিনই সাদাসিধে কাঠের তৈরি, এমনকি রং করাও হয়নি। কিন্তু মেমফিসের মেয়েরা সুকুমার তরুণ হেনরির জন্য একটা দামী ধাতুনির্মিত কফিন কিনে দিয়েছে। স্বপ্নে যেমন দেখেছিলেন, ঠিক সেভাবেই সেই কফিনটাতে হেনরিকে শুয়ে থাকতে দেখলেন মার্ক টোয়েন। ব্যতিক্রম শুধু একটাই– বুকের উপরের লাল কেন্দ্রবিন্দুসহ সাদা ফুলের তোড়াটা নেই। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের দৃশ্যটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। এক শোকাহত বয়স্ক মহিলা ঘরে প্রবেশ করলেন হাতে বিরাট একটা সাদা ফুলের তোড়া নিয়ে– যার মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে রক্ত-লাল একটা গোলাপ কুঁড়ি।

মোঃ আতিকুল ইসলাম

ড. নওয়াজেশ আহমদের ‘সমন্বয়ের সন্ধানে’

মতিন রায়হান

আমি মনে করি বিজ্ঞানের সঙ্গে পেইন্টিং, সঙ্গীত কিংবা আলোকচিত্রের কোন দ্বন্দ্ব নেই, আছে সমন্বয়। ক্যামেরা আমাকে জীবনের স্বাদ দেয়।— এমন অভিব্যক্তিই মেলে ধরলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলোকচিত্রী ও পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. নওয়াজেশ আহমদ তাঁর ‘সমন্বয়ের সন্ধানে’ শীর্ষক দু’সপ্তাহব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। গত ১১ জুলাই ঢাকার বেঙ্গল শিল্পালয়ের বেঙ্গল গ্যালারি অব ফাইন আর্টসে শুরু হয়েছে এ প্রদর্শনী। ১৯৪৭ থেকে ২০০৫, দীর্ঘ কালপরিক্রমা। বদলেছে সময় ও পরিবেশ, পাল্টে গেছে দেশ-বিদেশের ভৌগোলিক সীমারেখা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ঘটেছে নানা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একুশের শতকের বিজ্ঞানও এখন নতুন চারিত্র্য নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। সময়ের এই যে বহমানতা, এটা কি বিচ্ছিন্ন কিছু? অবশ্যই না। এই দীর্ঘ প্রবহমানতায় রয়েছে এক ধরনের সংহতি, সমন্বয়। এই সমন্বয়ের সন্ধানই করেছেন আলোকচিত্রী ড. নওয়াজেশ আহমদ। এ ক্ষেত্রে তার বাহন হয়েছে ক্যামেরার আলো-আঁধার। সেই ১৯৪৭ সালে তোলা ‘স্ট্রাগল’ ছবিটি আমাদের লড়াই অর্থাৎ জীবনযুদ্ধের যে পাঠ নিতে বলে তা কি ফুরিয়ে গেছে আজ?— না, বরং এ লড়াই আরও তীব্র হয়েছে, জাতীয়তা ডিঙ্গিয়ে আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার ক্ষুধাপীড়িত, দুর্ভিক্ষতাড়িত দেশগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

২০০৫ সালের ‘লেট মি লীভ’ শীর্ষক তাঁর যৌগিক চিত্রটি (photo montage) আমাদর কী বলে? বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বিশেষ করে ইরাকের মানবিক বিপর্যয় বোধসম্পন্ন যে কোন মানুষকে মর্মাহত করছে। ইরাকে এখন লড়াই চলছে অস্তিত্বের, স্বাধীনতার। ছবিটিতে দেখা যায়, একটি আহত রক্তাক্ত শিশুর মুখ, একটি চলন্ত ট্যাঙ্ক, ১৪/১৫ জন পদাতিক সৈন্যের মুভমেন্ট, বিপন্ন প্রকৃতির মধ্যেও একটি শিশুর খেলার আনন্দ, সব মিলিয়ে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতির একটি প্রতীকী উদ্ভাস। এখানেও কি সমন্বয়ের অন্বেষা চোখে পড়ছে না? এ রকম ১২৪টি আলোকচিত্র নিয়ে শিল্পীর এবারের প্রদর্শনী। প্রবীণ এই শিল্পী ক্যামেরাকেই করেছেন জীবনের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। জীবনে বিস্তর ছবি তুলেছেন তিনি। দেশ-বিদেশের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মারক এসব ছবি। এত এত ছবি থেকে মাত্র ১২৪টি ছবি নির্বাচন করে এ রকম প্রদর্শনীর আয়োজন প্রকৃত অর্থেই দুরূহ। তবু এ কথা বলতেই হয়, শিল্পী এ কাজে অসফল হননি। রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন, জীবনানন্দের ধানসিঁড়ি, উত্তাল পদ্মা, হিরোশিমার আর্তনাদ থেকে শুরু করে বিচিত্র মানুষ, ফুল, পাখি, বৃক্ষ, নদী কী নেই তাঁর ছবিতে? এ প্রদর্শনীটি প্রকৃত অর্থেই আমাদের দেখা দরকার। এর উদ্বোধন করেছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি শামসুর রাহমান। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের পরিচালক লুভা নাহিদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রবীণ আলোকচিত্রী নাইব উদ্দিন আহমদ এবং নাট্যজন আলী যাকের। প্রদর্শনী চলবে আগামী ২৪ জুলাই, প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত।

বাবার সঙ্গে যুদ্ধ!

এথিনা ওনাসিস রাসেল, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে কম বয়সী ধনী মহিলা, যিনি এতদিনে প্রকৃত ভালবাসার স্বাদ পেয়েছেন। গ্রীসের শিপিং মিলিয়নার এরিস্টটল ওনাসিসের নাতনি ২০ বছর বয়সী এথিনা ৩২ বছর বয়সী প্রিয় বন্ধু ব্রাজিলের আলবারো ডোডাকে বিয়ে করেন গত ৩ ডিসেম্বর। ডোডা এবং এথিনা ২০০০ সালের অলিম্পিকে ঘোড়দৌড় ইভেন্টসে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নেন। তবে হালের গরম খবর হচ্ছে এথিনা খুব দ্রুত আরও ধনী হতে যাচ্ছেন। সম্প্রতি তাঁর দাদার বিশাল সম্পত্তির শেয়ার দাবি করে তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে আইনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন।

এইজলেস বিউটি

তাঁর সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বয়স যেন কোন বাধাই নয়। ষাটোর্ধ বয়সেও তিনি অসাধারণ গ্ল্যামারাস। বয়সের কোন চিহ্ন নেই তাঁর ীরে। গলার চামড়া কুঁচকে আসেনি, কপালে বলি রেখা পড়েনি, গালের চামড়াও ঝুলে পড়েনি। হ্যাঁ ‘টু উইমেন’ খ্যাত হলিউডের এক সময়ের হার্টথ্রব অসাধারণ অভিনেত্রী সোফিয়া লরেনের কথাই বলা হচ্ছে। রঙিন পর্দার গ্লামার জগত থেকে বিদায় নিলেও নিজেকে গুটিয়ে রাখেননি তিনি। বরং এখনও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পর্দা কাঁপানো গ্ল্যামার নিয়েই সগৌরবে উপস্থিত হন। ছবি দেখে পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তাঁর সম্পর্কে বলা কথাগুলো অতিরঞ্জিত নয়! ছবিতে কালো রঙের কাঁধখোলা গাউনের সঙ্গে গলায় জড়িয়েছেন হীরাখচিত নেকলেস এবং কানে একই সেটের দুল। চমৎকার সাজে ফ্যাশন ব্যক্তিত্ব জর্জিও আরমানির বাহুবদ্ধ হয়ে সম্প্রতি তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন মিলানের থিয়েটার হল ীট ওডদটফটহ উপস্থিত হন, যা নাট্যকলার স্বর্গঘর বলে পরিচিত।

শোলা বা পর্যটন পাখা

এগুলো তালপাতা কিংবা কাপড়ের পাখা নয়, শোলার তৈরি বাহারি পাখা। অনেকে একে ওয়ান টাইম কিংবা পর্যটন পাখাও বলে থাকেন। এ পাখা হাল্কা এবং সহজে নষ্ট হয়ে যায় বলে সচরাচর বাসাবাড়িতে এগুলো খুব একটা ব্যবহৃত হয় না। গ্রীষ্মকালে ভ্রমণের সময় শৌখিন পর্যটক কিংবা যাত্রীরা গরম থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে শোলার এ পাখা ব্যবহার করেন। বিশেষ করে পর্যটন এলাকা, পার্ক, পিকনিক স্পটগুলোতে এর কদর বেশি। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর, রূপগঞ্জের রাসেল পার্ক, রাজধানীর ন্যাশনাল পার্ক, চিড়িয়াখানা, চট্টগ্রামের ফয়’স লেক এলাকায় এ পাখা বেশি পাওয়া যায়। তবে নারায়ণগঞ্জের চিটাগাং রোড বাসস্ট্যান্ড, গাবতলী টার্মিনাল ও সায়দাবাদ বাসস্ট্যান্ডে এ বাহারি পাখা বেশি পাওয়া যায়।

মূলত শোলার এ বাহারি পাখা তৈরি হয় নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ, সোনারগাঁও ও আড়াইহাজারের ক’টি গ্রামে। এখানকার প্রায় অর্ধশত পরিবার দীর্ঘদিন ধরে গ্রীষ্মকালে এ পাখা তৈরির সঙ্গে জড়িত। এটা তাদের মৌসুমী পেশা। এখান থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার পিস বাহারি পাখা রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। এ পাখাশিল্পের সঙ্গে জড়িত সোনারগাঁওয়ের হরেকান্ত দে (৬০) জানালেন, প্রতি গ্রীষ্ম মৌসুমে তাঁর পরিবার থেকেই ৫/৬ হাজার পিস শোলার পাখা তৈরি হয়ে বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। আড়াইহাজারের শোলার পাখার কারিগর রমেদ বিশ্বাস বলেন, ব্যবসাটা মন্দ নয়। প্রতি পাখায় তাঁদের খরচ পড়ে তিন থেকে চার টাকা, আর তা অনায়াসেই বিক্রি হয় ৬ থেকে ১০ টাকায়। তবে তিনি ইদানীং এ পাখার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত শোলার সঙ্কটের কথা জানালেন। এ পাখা তৈরিতে বাঁশের চটা, ধঞ্চের শোলা ও রঙের প্রয়োজন হয়। হালে শো-পিস হিসেবেও এ পাখার কদর বেড়েছে।

মীর আব্দুল আলীম

শতাব্দীর স্রোত

প্লাইস্টোসিন পার্ক

ফেরদৌস আকিক

ঠিক ১০০০০ বছর আগে সর্বশেষ বরফ যুগ শেষ হবার আগে ইকোসিস্টেম যেমনটি ছিল, ঠিক সেই অবস্থাটাই সাইবেরিয়ার একটি অংশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে। ‘প্লাইস্টোসিন পার্ক’ নামের এই গবেষণাটি করা হবে সাইবেরিয়ার সিক্ত ও পঙ্কিল তুন্দ্রা অঞ্চলটিকে আবার শুষ্ক ঘাসময় প্রান্তরে রূপান্তরিত করার জন্য, যেখানে এক সময়ে একটি বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণীগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। এই প্রাণীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল বাইসন, ঘোড়া, রেইনডিয়ার, মাস্ক-অক্সেন, এলক, সাইগা, বলদ, গণ্ডার এবং ম্যামথ। জানা যায়, প্রাণীদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী সিংহ আর নেকড়েও এই গোষ্ঠীর সঙ্গেই বসবাস করত। আশা করা হচ্ছে, এখনকার দিনে যে সমস্ত প্রাণী টিকে আছে, এই গবেষণার মাধ্যমে সাইবেরিয়াতে আবারও এদের আবাসস্থল গড়ে তোলা সম্ভবপর হবে।

রাশিয়ার চেরস্কির নর্থইস্ট সায়েন্স স্টেশনের পরিচালক সেরগেই জিমভ বলেছেন, “এই ধারণাটি করা হয়েছে কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য, যা ব্যাখ্যা করবে ইকোসিস্টেমে ১০০০০ বছর আগে কেন এই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছিল। আমরা আবার সেই ইকোসিস্টেমটিকেই সৃষ্টি করতে চাই, যে ইকোসিস্টেমে এক সময় বাইসন, ঘোড়া, গণ্ডার আর অন্যান্য প্রাণীর সত্যিকার মিলনমেলা ছিল।” তিনি বিশ্বাস করেন, একটি অঞ্চলের গাছপালা সাধারণত সেই অঞ্চলের প্রাণীদের অস্তিত্বের ফলেই নিয়ন্ত্রিত হয়। তিনি আশা করেন, এ জাতীয় প্রাণীদের যদি বর্তমান তুন্দ্রা অঞ্চলে ছেড়ে দেয়া হয়, তা হলে তারা বিস্তীর্ণ তৃণভূমির সমস্ত তৃণ বা ঘাস চিবিয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে। ফলে মাটির নিচেকার আর্দ্রতা বিলীন হয়ে যাবে। এর পর সেখানে যে শুষ্ক ভূমির উদয় হবে, তা ঘাসের প্রান্তর হিসেবে রূপান্তরিত হতে বেশি সময় নেবে না। কারণ ঘাস প্রাণীদের প্রিয় খাবার। ড. জিমভ তাঁর এই থিওরিটি বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বেছে নিয়েছেন একটি ছোট্ট অঞ্চল আর সাহায্য প্রার্থনা করেছেন রিপাবলিক অব ইয়াকুশিয়ার সরকারের কাছে এই বলে যে, কোলিমা নিম্নভূমির ১৬০ স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা জুড়ে তাকে যেন কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়। এখানে মূলত ছেড়ে দেয়া হবে রেইনডিয়ার, মুস,

ইয়াকুশিয়ান ঘোড়া, মাস্ক-অক্স এবং কিছু ছোট আকৃতির প্রাণী, যেগুলো মূলত তৃণভোজী। পাশাপাশি একথাও ভাবা হচ্ছে যে, যেসব প্রাণী অনেক উঁচু পর্যন্ত লাফাতে পারে, তাদের জন্য পার্কের দেয়াল উঁচু করে দেয়া হবে। সবকিছুই এখানে রয়েছে, কেবল বাইসন আনা হবে কানাডা থেকে। এদের সঙ্গে অবশ্য কিছু শিকারী প্রাণী, যেমন, সাইবেরিয়ান টাইগারও থাকবে।

তবে অন্যদিকে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনের প্লাইস্টোসিন ম্যামাল সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর অ্যাড্রিয়ান লিস্টার বলেছেন, তিনি জানেন না এই গবেষণাটি সঠিকভাবে কাজ করবে কিনা। তাঁর মতে, "জিমভ যা বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর এই থিওরিকে সমর্থন করছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, একটি বিশাল মানচিত্রকে আবারও এই থিওরির আলোকে তৈরি করা গেলেও, তা কিছুটা হলেও হবে শুভঙ্করের ফাঁকির মতোই। কিন্তু জিমভ বলেছেন, তিনি গবেষণাটি করার জন্য ব্যবহার করবেন একটি ছোট্ট জায়গা। আমার ধারণা, এর জন্য একটুখানি জায়গাতে বেড়া দিয়ে কিছু বাইসন আর ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দেখা যাক, তাতে কী ধরনের কাজ হয়।" এই গবেষণার একটি দিক হচ্ছে, কী করে ম্যামথ আর উলি রাইনো বিলুপ্ত হয়ে গেছে, সেটা প্রমাণ করা। প্রফেসর লিস্টার আরও বলেছেন, "সর্বশেষ বরফ যুগের আগেভাগে যে আবহাওয়াগত পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল, তার মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে অঞ্চলটি হয়ে পড়েছিল উষ্ণ ও আর্দ্র। তাই সাধারণভাবেই এই মডেলটি দিয়েই দেখানো যায় শুষ্কভূমি এভাবেই পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানকালের আর্দ্র তুন্দ্রাতে পরিণত হয়েছিল। তবে এ ছাড়া আরেকটি দিক থেকে জিমভ তাঁর গবেষণা চালাতে পারেন, আর সেটা হচ্ছে, আধুনিক মানুষ যখন এই বিশাল অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল, তখন তারা এসব প্রাণীকে সম্ভবত অকাতরে হত্যা করেছিল। যখনই অধিকহারে প্রাণীনিধনযজ্ঞ চলেছে, তখনই দেখা গেছে যে, ঘাস খাওয়ার আর কোন প্রাণী অবশিষ্ট নেই। ফলে নিচের মাটি ওপরে না ওঠায় অঞ্চলটি পঙ্কিল তুন্দ্রায় পরিণত হয়েছে। তবে এই 'ওভারকিল' মডেলে হয়তবা মানুষের সংখ্যা খুব কম ছিল। আমরা এখানে কেবল মানুষের হাতে আক্রান্ত প্রাণীদের কথাই বলতে পারি। এমনও তো হতে পারে যে, "প্রাণীকে দিয়েই প্রাণী নিধন হয়েছে।"

এই গবেষণার আরেকটি উপকারী দিক হিসেবে দেখানো হয়েছে যে, প্লাইস্টোসিন পার্কে প্রচুর পরিমাণে কার্বন রয়েছে এবং যা রয়েছে তুন্দ্রার বরফে নিমজ্জিত অবস্থায়, সেটা তাকে আবহাওয়াতে প্রবেশে বাধা দিতে পারে। কারণ, এখন শোনা যাচ্ছে যে, বাতাসে কার্বনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে। ড. জিমভ ধারণা করছেন, আবারও ঘাসের উৎপত্তি এবং এদের রুট সিস্টেম ভূমির উর্বরতা বাড়িয়ে দিতে পারে।

টেম্পল-১

পারভীন সুলতানা

শুধু বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, মানবজাতির জন্য ঘটনাটি যেমন বিস্ময়কর তেমনি অহঙ্কারেরও বটে। চাঁদ নয়, অন্য গ্রহ নয়, একেবারে ধূমকেতুর রহস্য জানার দুঃসাহস জেগেছিল পৃথিবীর মানুষের। সে জানার স্পৃহায় তারা চালিয়েছে তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে গত ৪ জুলাই। যুক্তরাষ্ট্রের নাসা প্রতিষ্ঠান 'ডিপ ইমপেক্ট' নামে একটি মহাশূন্যযান নিক্ষেপ করে ঐ দিন। সেই নিক্ষিপ্ত মহাশূন্যযান থেকে ইমপেক্টর স্পেস ক্র্যাফট 'টেম্পল-১' নামের এক ধূমকেতুকে আঘাত হানে। সময়টা ছিল বাংলাদেশের সকাল ১১টা ৫২ মিনিট। আর গ্রীনিচ সময় ছিল সকাল ৬টা ৭ মিনিট। ঘণ্টায় ২৩ হাজার মাইল গতিতে যে ধূমকেতু ছুটে চলছে তাকে ধরা কি সোজা কথা? তাই ইমপেক্টরের গতি করা হয় ঘণ্টায় ৩০ হাজার মাইল। পৃথিবী থেকে ৮ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরে যখন টেম্পল-১ এসে পৌঁছে তখনই ইমপেক্টরকে নিক্ষেপ করা হয়। এই প্রচণ্ড গতির দু'টি বস্তুর সংঘাতে যে আলোর তীব্র ঝলকানি সৃষ্টি হয় তা বাংলাদেশের মানুষ না দেখলেও উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও এ্যান্টার্কটিকা থেকে দেখা গেছে অবশ্যই টেলিস্কোপের সাহায্যে। স্পেসক্র্যাফটির ওজন ছিল ৮২০ পাউন্ড আর ধূমকেতুটির আয়তন .২৮ বর্গ কি.মি. যা যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যানহাটনের জায়গাটার সমান।

সোজা কথায় বলতে গেলে পৃথিবী জন্মকালীন সময় কী অবস্থায় ছিল তা জানার যে এক ব্যাকুল আগ্রহ হাজার বছর ধরে মানুষ লালন করে আসছে, তা মিটানোর জন্য ৩০ কোটি ৩০ লাখ ডলার খরচ করে এই মহাকাশ অভিযান চালানো হয়। পৃথিবীর জন্মক্ষণের পরিবেশ এবং অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা যেমন ভূমিকম্প, অগ্ন্যুপাতের কারণে। কিন্তু কোটি বছর আগের ধূমকেতু একই অবস্থায় আছে। এই ধূমকেতুর গায়ে যদি গর্ত করা যায় তাহলে সে গর্ত থেকে অনেক উপাদান তুলে আনা যাবে, যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব কোটি বছর আগে পৃথিবী কেমন ছিল। 'ডিপ ইমপেক্ট' হতে নিক্ষিপ্ত ইমপেক্টর এই কাজটি করেছে। তার আঘাতে টেম্পল-১ ধূমকেতুতে ফুটবল আকারের ২০ থেকে ৫০ ফুটের গভীর একটি গর্ত সৃষ্টি হয় এবং গর্ত থেকে উৎক্ষিপ্ত বহু উপাদান ছিটকে পড়ে। ঠিক সে মুহূর্তে ডিপ ইমপেক্ট ট্যাম্পল-১-এর ৫০০ কি.মির কাছাকাছি চলে আসে এবং স্থাপিত ক্যামেরা উত্থিত বস্তুগুলোর ছবি তুলে ও অন্য যন্ত্রপাতি সেসব বস্তু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করে। ধূমকেতু এক চিররহস্যময় মহাশূন্য বস্তু। এরা সাধারণত সৌরজগতের শেষ মাথায় 'উর্টস ক্লাউডস' নামে অত্যন্ত শীতল এলাকায় জন্ম হয় এদের। এরা উর্টস ক্লাউডস থেকে এসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আবার সে জায়গায় ফিরে যায়। টেম্পল-১ ধূমকেতু ১৮৬৭ সালে আবিষ্কৃত হয়।

রেফ্রিজারেটর আকৃতির ইমপেক্টর টেম্পল-১ কে আঘাত হানার কয়েক ঘণ্টাজুড়ে দেখা গেছে গ্যাস ও ধুলা নভোযান ডিপ ইমপেক্টকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। এই গ্যাস ও আচ্ছাদন পুরোপুরিভাবে চলে যায়নি। বৈজ্ঞানিকরা আশঙ্কা করছেন, এটা সপ্তাহখানেব থাকবে। নভোযান কর্তৃক ধূমকেতু সংঘর্ষের পর এক সংবাদ সম্মেলনে নাসার বিজ্ঞানীরা এ কথা জানায়। উল্লেখ্য, এই মহাশূন্য অভিযানে নাসার সঙ্গে কাজ করে জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরি, ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড ও ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির বিজ্ঞানীরাও। সামনের সপ্তাহ ও মাসজুড়ে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত থাকবেন সংঘাতের ফল নির্ণয়ে। তাঁরা জানতে চেষ্টা করবেন ধূমকেতুর উপাদান সম্পর্কে, যা সৌরজগত সৃষ্টির রহস্য উন্মোচন করতে পারে এবং পৃথিবীর জন্ম রহস্যও। এছাড়া এই গবেষণা বা নিরীক্ষণের ফলে ভবিষ্যত পৃথিবীকে আঘাত হানতে পারে এমন ধূমকেতুর পথ পরিবর্তন করার কৌশলও জানা যেতে পারে। ডিপ ইমপেক্ট অভিযানদল এই সংঘর্ষকে "বুলেটের সঙ্গে বুলেটের সংঘর্ষ" বলে অভিহিত করে। সংঘর্ষে যাওয়ার ঠিক তিন সেকেন্ড আগে ইমপেক্টরের ক্যামেরা বা ইমেজিং সিস্টেম আলু আকৃতির কমেটের ছবি পাঠায় এবং ফ্লাইবাই সংঘর্ষ ঘটনাটি নিরীক্ষণ করে ৫০০ মাইল দূর থেকে।

ইমপেক্ট টেম্পল-১ কে আঘাত হানার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক আলোকিত হয়ে উঠে, সেকেন্ডের মধ্যে বরফ ও ধুলার কণা সংঘর্ষে সৃষ্ট গর্ত থেকে চারদিক ছিটকে পড়ে।

অনেকে আশঙ্কা করছেন, ধূমকেতুকে আঘাত করা বা তার পথ পরিবর্তন করায় সৌরজগতের ওপর কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কিনা। উত্তর হলো– না, মোটেও না।

গভীরতম গুহায় অভিযান

তাহমিনা জাহান

একদল ইউক্রেনিয়ান অভিযাত্রী পৃথিবীর এমন এক গভীর গুহায় পৌঁছে গেছেন যার গভীরতা ২০৮০ মিটার (৬৮২২ ফুট)। গুহাটির নাম কুবেরা। জর্জিয়ার আবখাজিয়াতে অবস্থিত। বিশ্বের গভীরতম গুহা বলে একে অবহিত করা হয়। এর আগে এই গুহার ২০০০ মিটার পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সম্প্রতি নয়টি শক্তিশালী গ্রুপ এই প্রজেক্টে কাজ করে ২০০০ মিটারের রেকর্ডকে ভেঙ্গে আরও সামনে গিয়ে স্থাপন করেছে এক নতুন রেকর্ড। তারা এই যাত্রা করে পূর্ববর্তী রেকর্ডের ওপর ভিত্তি করেই। এগোতে এগোতেই তারা দেখতে পায় গুহাটির অলিগলি বিভিন্ন দিকে গেছে যা কিনা আবখাজিয়া ছাড়িয়ে জর্জিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের দিকেও বিস্তৃত।

আলেক্সান্দার ক্লিমচোউক মিশনটি পরিচালনা করছেন। তাঁর মতে, আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে এ গুহার সর্বশেষ পয়েন্টে আমরা পৌঁছতে পেরেছি কিনা। তবে যদি এই অভিযান বন্ধ করে দেয়া না হয় তাহলে আমরা এর আরও গভীরে যেতে পারব বলে আশা রাখি। ইউক্রেনিয়ান স্পেলিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের এই কল অফ দ্য এ্যাবিস প্রজেক্টের অর্থায়ন করেছে ইউএস ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটি। ২০০৪ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে যে অভিযানটি চালিয়েছিল ৫৬ জন গবেষকের একটি টিম, তাঁরা পশ্চিম ককেশাসের আরাবিক মাউন্টেনের নিচে অবস্থিত এই কুবেরা নামক গুহা আবিষ্কার করেন।

গুহার এত ভিতরে পৌঁছতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। পাঁচ টন ইকুইপমেন্ট বহন করে তাঁরা এগিয়ে যান সামনের দিকে, এর মধ্যে তাঁদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে পানির হিমশীতল স্রোত। সামনে এগোনোর জন্য তাঁদের ভাঙতে হয়েছে অনেক প্যাসেজ যা খুব কঠিনভাবে আটকে দিয়েছিল গুহার গভীরে যাবার রাস্তা। তাঁরা ক্যাম্প সেট করেছিলেন গুহাভ্যন্তরে ৭০০, ১২১৫, ১৪১০ আর ১৬৪০ মিটার দূরে দূরে। এখানেই তাঁরা রান্না করে খেয়েছেন, ছয়জন করে পালা করে ঘুমিয়েছেন প্রতিটি তাঁবুতে এবং প্রায় ২০ ঘণ্টা করে রোজ কাজ করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য ব্যবহার করেছেন একটি দুই মাইল লম্বা শক্ত দড়ি যার ভিতরে স্থাপন করা হয়েছিল একটি টেলিফোনের তার।

কিন্তু আগস্ট-সেপ্টেম্বরের অভিযানকারীরা অনেক বড় বড় বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁদের অভিযানের তৃতীয় সপ্তাহে একটি শীতল পানির পুকুর সামনে এগিয়ে যাওয়াকে রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

তবে অক্টোবর মাসে এই নয় গ্রুপের টিমটিকে আবার কুবেরাতে পাঠানো হয় যেখানে আগের গ্রুপটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। তাঁরা গুহাভ্যন্তরে দেখতে পেয়েছেন বহু প্যাসেজ ও ভার্টিক্যাল খাত। এ রকম একটি খাতেই পূর্বের অভিযাত্রীদের লিডার ইউরি কাসজান পড়ে

গিয়েছিলেন এবং এখানে তাঁর অলটিমিটারটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল যা থেকে বোঝা গেছে তাঁরা গুহার ২০০০ মিটার পর্যন্ত এগুতে সক্ষম হয়েছিলেন। আরও অনেক খাত ও প্যাসেজ অভিযাত্রীরা আবিষ্কার করেছেন ২০৮০ মিটার দূরত্ব অতিক্রমের পর। তাঁরা সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পেরেছেন এখানে আগে কখনই কোন মানুষের পায়ের ধুলা পড়েনি। তবে ইতোমধ্যে জানানো হয়েছে এই অভিযানের সফলতার কথা, কিন্তু গবেষকরা আবারও গুহাটিতে ফিরে যেতে চান এবং দেখতে চান এর গভীরতা আর কত!

জেন গুডালের পৃথিবী

শান্তা মারিয়া

জীববিজ্ঞানী এবং জীববিজ্ঞানের উৎসাহী পাঠকের কাছে জেন গুডাল নামটি নতুন করে বলার কিছু নেই। তাঁর একক প্রচেষ্টায় শিম্পাঞ্জি সম্পর্কে জানা গেছে বহু অজানা তথ্য। মানুষের নিকটতম এই জ্ঞাতিদের আচরণ পর্যবেক্ষণে জুড়ি নেই তাঁর। ১৯৬০ সালে তিনি প্রথম শিম্পাঞ্জি বিষয়ক গবেষণা শুরু করেন। পশ্চিম তানজানিয়ার গমবি স্ট্রীম রিজার্ভ অরণ্যে বসবাসরত শিম্পাঞ্জি দলের ওপর পর্যবেক্ষণ শুরু করেন তিনি। ১৯৬৭ সালে গমবি স্ট্রীম শিম্পাঞ্জি রিসার্ভের পরিচালক নিযুক্ত হন। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ হলো ইন দ্য শ্যাডো অব ম্যান (১৯৭১), দ্য শিম্পাঞ্জিস অব গমবি (১৯৮৬), দ্য টেন ট্রাস্টস : হোয়াট উই মাস্ট ডু টু কেয়ার ফর দ্য এ্যানিম্যালস উই লাভ (২০০২) ইত্যাদি। জেন গুডলারের জন্য শিম্পাঞ্জি নিয়ে শুরুটা যথেষ্ট কঠিন ছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর স্বপ্ন ছিল আফ্রিকাকে ঘিরে। এক বন্ধুর কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিনি আফ্রিকায় যান।

আফ্রিকাতেই পরিচয় হয় বিখ্যাত প্যালিও আর্কিওলজিস্ট (প্রত্ন জীববিজ্ঞানী) লুইস লিকির সঙ্গে। তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে কাজ শুরু করেন। তিনি জেনকে শিম্পাঞ্জি সম্পর্কে গবেষণার উৎসাহ দেন। তবে ২৭ বছরের একটি তরুণীর পক্ষে সে সময়ে কাজটি খুব সহজ ছিল না।

জেন গুডাল যখন শিম্পাঞ্জি দলের কাছে যান, তখন তারা ভয় পেয়ে যায়। সাদা রঙের এপ তাঁরা আগে কখনও দেখেনি। সবাই দৌড়ে পালিয়ে যায়। ভয় ভেঙ্গে গেলে তারা মনে করে জেন হয়ত তাদের শিকার করতে এসেছে। তখন তারা জেনের সঙ্গে হিংস্র আচরণ শুরু করে। দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখায়, ডালপালা ছুঁড়ে মারে। পরে অবশ্য তারা শান্ত হয়। জেনকে তারা নিজেদের মধ্যে মেনে নেয়। তবে জেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে তাদের সময় যথেষ্ট লেগেছে। জেনের পর্যবেক্ষণের আগে মনে করা হতো শিম্পাঞ্জিরা গড়পড়তা সব একরকম। কিন্তু জেন বলেছেন, মানুষের মতো তাদেরও পৃথক ব্যক্তিত্ব রয়েছে। একেকটি শিম্পাঞ্জির স্বভাব একেকরকম। তাদের আনন্দ, যন্ত্রণা, ভয় বা বন্ধুত্বের অভিব্যক্তি একেকরকম। মানুষের মতোই তাদের আবেগ অনুভূতি রয়েছে। জেনের পর্যবেক্ষণের ফলে প্রাণীদের আচরণ বা এ্যানিমেল বিহেবিয়ার সংক্রান্ত বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। মানুষের প্রবৃত্তিগত আচরণের সঙ্গে শিম্পাঞ্জিদের প্রবৃত্তিগত আচরণের কোন পার্থক্য নেই। তবে মানুষের হাতে রয়েছে 'ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের একটি মারাত্মক ক্ষমতা। শিম্পাঞ্জিরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে, কিছু শব্দও সৃষ্টি করতে পারে। মনেরভাব প্রকাশের জন্য তারা মুখে নানারকম শব্দ করে। কিন্তু তা কখনই মানুষের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ 'ভাষা' নয়। মানুষ অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিতে পারে। পরস্পরের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পারে। ভাষা আছে বলেই তা সম্ভব। তবে জেন মনে করেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ক্রমশই সম্পর্কহীন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ভবিষ্যত প্রজন্ম ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই গ্রহে, একই সূর্যের আলোয় জীবনধারণ করেও আমাদের সহবাসিন্দা (জীবজন্তু) সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমরা জানি না। শিম্পাঞ্জি, গরিলা এরা আমাদের নিকট জ্ঞাতি। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের আচরণ আদিম মানুষের অনুরূপ। অথচ তাদের সঙ্গে আমাদের সমাজের কোন যোগাযোগই নেই। একথা জেন গুডাল বলতেই পারেন। তিনি তো তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দিলেন এদেরই সঙ্গে।

পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ

নিম পৃথিবীর সবচেয়ে উপকারী গাছ। পাশ্চাত্যে নিম গাছকে 'মিরাকল ট্রি' বলে। এই গাছ 'ভিলেজ ফার্মেসি' হিসাবে পরিচিত। পৃথিবীর প্রায় ৩০টি দেশে নিম গাছ জন্মে। পশ্চিমা বিশ্বে নিমের ওপর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে। ইউএসএ টুডে পত্রিকায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি লোক নিম গাছ থেকে উপকৃত হতে পারে। নিম গাছ থেকে কীটনাশক, সার, ওষুধ ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব। ভূমিভাঙ্গন ও মরুকরণ রোধ এবং তাপমাত্রা হ্রাসেও ভূমিকা রয়েছে এই গাছের। নিমের পাতা, বীজ, ফল, ডালপালা, শিকড়, বাকল, ফুলসহ সব কিছুই মানুষের কাজে লাগে। নিম থেকে তৈরি ওষুধ, কীটনাশক, সার ব্যবহারে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। নিম পাতার রস—কৃমি, ঘা, ফোঁড়া, খোসপাঁচড়া, চর্মরোগ, গুটি বসন্ত, জলবসন্ত, হাম, ব্রণ, জ্বর, সর্দি, কাশি, অরুচি, বদহজম, কফ, বমি, কুষ্ঠ রোগ সারায়। নিমের বীজের তেল মাথা ঠাণ্ডা রাখে, উকুন মারে, চুল বাড়ায়, চুলপড়া বন্ধ করে ও বাতরোগ সারায়। নিমের বাকলের গুঁড়া জ্বরের খুব ভাল ওষুধ। আরও নানা রোগ দূর করতে ও শরীর সুস্থ রাখতে নিম গাছের পাতা, ফুল, আঠা, বাকল ইত্যাদি বেশ কাজে লাগে। আরও চমকপ্রদ তথ্য হলো, ভারতের ইনিউনোলজি হাসপাতালের ডাক্তাররা নিম থেকে গর্ভনিরোধক 'স্পার্নি সাইডাল ক্রিম' তৈরি করেছে। এটি ব্যবহারে এক শ' ভাগ সাফল্য পাওয়া গেছে। নিমের তেল শুক্রাণু/ডিম্বাণুর কার্যক্ষমতা নষ্ট করে। নিম বীজের তেল দিয়ে প্রায় ২০০ প্রজাতির ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন করা যায়। শস্য সংরক্ষণে নিমের পাতা ব্যবহার করা হয়। মশা দমনের জন্য নিমের তেল ১৫ ভাগ ও ৮৫ ভাগ কেরোসিন মিশিয়ে কেরোনিম লিকুইড তৈরি করতে হয়। ১ লিটার পানিতে ১০ মিলিলিটার কেরোনিম লিকুইড মিশিয়ে মশার উৎপত্তিস্থানে সপ্তাহে ২-৩ বার স্প্রে করলে মশা নির্মূল হয়। ইউরিয়া সারের সঙ্গে নিম পাউডার বা নিমের গুঁড়া মিশিয়ে জমিতে প্রয়োগ করলে ২৫ ভাগ বেশি ফলন হয়। নিমের গুঁড়া উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান মাটিতে সংরক্ষণ করে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও মাটির ক্ষতিকর পোকামাকড় ধ্বংস করে। আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট পরীক্ষা করে দেখেছে যে, নিমের খৈল ধানের জন্য সহজলভ্য এমোনিয়াম নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট-এ রূপান্তরিত করে, যা মাটিকে নাইট্রেট লবণমুক্ত করতে সাহায্য করে। নিম গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে, তাপমাত্রা কমায়। নিমের তেল দিয়ে ল্যাম্প জ্বালানো যায়। বীজের মণ্ড দিয়ে মিথেন তৈরি করা যায়। পাতার গুঁড়া দিয়ে ফেসক্রিম এবং তেল দিয়ে নেলপালিশ তৈরি করা যায়। নিমের অনেক প্রসাধনী তৈরি হচ্ছে যেমন—টুথপেস্ট, সাবান, তেল, লোশন ইত্যাদি। সবাই নিম গাছ রোপণ করতে পারেন। রোপণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন-আগস্ট। ৫-৬ বছরেই অনেক বড় হয় এই গাছ।

ফরহাদ আহাম্মেদ

শতবর্ষে আপেক্ষিকতা, কত দূরে একীভূত তত্ত্বের স্বপ্ন

রুশো তাহের

নিউ ইয়র্কে প্রথম যাবার পর আইনস্টাইনকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনার আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের নাম শুনে মেয়েরা এমন উৎসাহিত হয়ে ওঠে কেন বলতে পারেন? আইনস্টাইন হেসে দিয়েছিলেন, "এর কারণ মেয়েরা নতুন নতুন ফ্যাশন পছন্দ করে, আর এ বছরের ফ্যাশন হলো আপেক্ষিকতাবাদ।" আপেক্ষিকতার মূল প্রতিপাদ্য হলো গতি। এই গতি একেকজনের কাছে একেক রকম। যেমন রেললাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া কোন ব্যক্তি দেখছেন ট্রেন ছুটে আসছে দ্রুত গতিতে এবং এক সময় তাকে অতিক্রম করে চলে যায়। আবার সেই ট্রেনের যাত্রীর কাছে মনে হবে হেঁটে চলা লোকটি, এমনকি রেললাইনের খুঁটি, পার্শ্ববর্তী ঘরবাড়ি ও হাঁটবাজারসহ সবকিছু পেছন দিকে চলে যাচ্ছে। এখানে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি, ঘরবাড়ি বা হাটবাজারের কি ইঞ্জিন ও চাকা আছে? মানে সেগুলো চলতে পারে না। চলছে তো ট্রেনই। কিন্তু আমরা জানি, ঘরবাড়ি, রেলপথ, হাটবাজার সবকিছু নিয়ে পৃথিবীটাই ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে, সূর্যও আবার স্থির নয়। সে-ও গ্যালাক্সি বা ছায়াপথের দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের একটি, যাদের সবাই ঘুরছে। আবার গ্যালাক্সিও স্থির নয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, মহাবিশ্বের এক শ' কোটি গ্যালাক্সির প্রত্যেকটিই পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অনেকটা একটি বেলুনের ওপর কতকগুলো কালির ফোঁটা দিয়ে বেলুনটাকে ফোলালে প্রতিটি ফোঁটা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাওয়ার মতো। সুতরাং কোনকিছুই গতিহীন বা নিশ্চল নয়। সব গতি বা সব স্থিতি আপেক্ষিক। আমরা যদি জানতে চাই কেউ সত্যি সত্যি চলছে কিনা। আর এজন্য একটির সঙ্গে অন্যটির তুলনা করলে চলবে না। মানে সত্যিকার গতি জানা যাবে না। বরং একটির তুলনায় অন্যটির গতি জানা যাবে। আসলে গতির চরম কোন সংজ্ঞা নেই, শুধু আপেক্ষিক গতিই জানা সম্ভব। এটাই হলো আপেক্ষিকতাবাদের মর্মার্থ।

১৯০৫ সালে আপেক্ষিকতা সংক্রান্ত আইনস্টাইনীয় তত্ত্ব প্রকাশিত হলেও এর ইতিহাস আরও আগের। গতি নিয়ে মানুষ প্রথম প্রশ্ন করে খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে। এর আগে বিশ্বাস করা হতো পৃথিবীই মহাবিশ্বের কেন্দ্রে আর তাকে ঘিরে পরিভ্রমণরত চাঁদ, সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র। সে যাই হোক শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শুনতে শুনতে এখন বাচ্চারাও অবলীলায় বলে দেয়, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে নয়। আর এই তত্ত্বের প্রবক্তা কোপার্নিকাস। ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে গ্যালিলিও গ্যালিলি কথোপকথন রীতিতে আপেক্ষিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্যালিলিও দেখিয়েছেন, কেন জাহাজের একজন যাত্রী তার দৃষ্টি পালের একেবারে ডগায় রাখলে, তার পরিবর্তন ঘটাতে হবে না জাহাজটি আরও জোরে চললেও। মানে চোখ নাড়াতে হবে না। গ্যালিলিও প্রাচীন ধারণার মুখপাত্র সিমপ্লিসিওকে দিয়ে বলিয়েছেন, "আমি যদি থেমে থাকা জাহাজের পালের ডগার দিকে একটা বন্দুক তাক করে

থাকি, জাহাজ চললেও সেদিকেই তাক করা থাকবে, তার জন্য আমাকে বন্দুক একচুলও সরাতে হবে না।" গ্যালিলিও এর ব্যাখ্যায় বলেন, জাহাজের যে গতি তা সিমপ্লিসিও এবং তার চোখের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। আর সেই কারণেই বিন্দুমাত্র না নড়েও সিমপ্লিসিও তার বন্দুকের তাক ঠিক রাখতে পেরেছে। তার কাছে জাহাজের পালের ডগাটা ছিল গতিহীন। পরন্তু সিমপ্লিসিও কোনক্রমেই নির্ধারণ করতে পারবে না পালের ডগার গতি আছে কি নেই। এই হলো আপেক্ষিকতার মূল কথা। নিউটনের গতি বিষয়ক দ্বিতীয় সূত্রেও গ্যালিলিওর আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সমর্থন মেলে। কোন বস্তুর ওপরে বল প্রয়োগের ফলে বস্তুর গতিতে কী ধরনের পরিবর্তন দেখা দেবে, তাই বলা হয়েছে এই সূত্রে। অর্থাৎ বলের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে কতটা ত্বরণ ঘটবে বস্তুর। যেমন কোন বস্তুর ওপরে কিছু পরিমাণ বল এক সেকেন্ড প্রয়োগে বস্তুটার গতিবেগ সেকেন্ডে ৪ মিটার বেড়ে গেল। কিন্তু এর ফলে বস্তুটির আসল গতিবেগ রয়ে গেল আমাদের অজানাই। সুতরাং নিউটনের গতিবিজ্ঞানের নিয়ম থেকে পাই, সরলরেখায় অপরিবর্তী গতির কোন প্রভাব নেই, আছে ত্বরণ বা গতির পরিবর্তনের হার। স্থান ও কালের সঙ্গে গতির সম্পর্ক এর ফলে জট হিসেবে দেখা যায়, যার গাণিতিক সমাধান নেই। কারণ এ ক্ষেত্রে সময় মাপতে গেলেই তা মাপতে হয় স্থান ও গতির পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমস্যা সমাধানে নিউটন স্থান ও কাল সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। তাঁর মতে, স্থান হচ্ছে এমন ব্যাপ্তি, যার মধ্যে সবকিছু ঘটে অর্থাৎ স্থান অনড় ও অবিচল এক বিস্তার যা সবকিছুকে ধারণ করে। কিন্তু প্রভাবিত করে না এবং প্রভাবিতও হয় না। তেমনি কালও নিরপেক্ষ সত্তা, যা নিজস্ব গতিতে প্রবহমান। কিন্তু কিছুর দ্বারাই প্রভাবিত হয় না। আইনস্টাইন নিউটনের এই তত্ত্বকে নাকচ করে দিলেন। তিনি বললেন, এমন কোন নির্দিষ্ট কিছু নেই, যা স্থানের মধ্যে স্থিরভাবে বসে আছে, যার তুলনায় পরম অবস্থানকে মাপা যাবে। তেমনি আমরা সময়কেও মাপছি কোন কিছুর গতি থেকে। এই সময় আইনস্টাইন মাইকেলসন ও মর্লির পরীক্ষা থেকে লক্ষ্য করেন আলোর গতি আলোর উৎসের বা দর্শকের গতি নিরপেক্ষ। আইনস্টাইন বললেন, পরমগতি বলে যেহেতু কিছু নেই আর আমরা যেহেতু গতি দিয়েই সময় মাপছি, ফলে পরম সময় বলেও কিছু নেই। গতির মতো সময়ও আপেক্ষিক। আমরা যা করতে পারি, তা হলো, সময়ের যুগপৎ বিচার। যদি বলা হয়, বাসটি এখানে আটটায় পৌঁছবে, তার মানে ঘড়ির ছোট কাঁটা আটের উপরে আসা আর বাসটার এখানে পৌঁছানো—এ দুটো ঘটনা যুগপৎ ঘটে। অর্থাৎ মহাবিশ্বে এমন কোন প্রমাণ ঘড়ি নেই—যার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা বলতে পারি বিশেষ কোন মুহূর্ত সবার জন্য একই। আইনস্টাইন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে স্থান ও কাল একীভূত করলেও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বেও আরও একধাপ এগিয়ে গেলেন। মাধ্যাকর্ষণের কারণ খুঁজতে গিয়ে তিনি বলেন, একটি রকেট যদি বিশেষ ত্বরণ নিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে, তাহলে বাইরের যোগাযোগহীন অবস্থায় এর মধ্যে আবদ্ধ একজনের কাছে মনে হবে মাধ্যাকর্ষণ তাকে নিচের দিকে টানছে। আবার কোন কিছু হাত থেকে ছেড়ে দিলে তা নিচের দিকে ত্বরিত গতিতে পড়তে থাকবে। তা হলে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ আর গতিবৃদ্ধিজনিত ত্বরণের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়ার উপায় নেই, যদি তারা সমান মানের হয়। এই সমতার নিয়মে তিনি দেখালেন, স্থান-কাল ও বস্তু একাকার। সহজে বলা যায়, নিউটনের তত্ত্বে স্থান তিন মাত্রিক এবং কালনিরপেক্ষ। আর আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বে স্থান ও কাল মিলে চার মাত্রিক জগৎ সৃষ্টি হলো এবং স্থান ও কাল তাদের নিরপেক্ষতা হারালো। কিন্তু বস্তু থাকল নিরপেক্ষ। এই চার মাত্রিক জগতের তল হলো সমতল। কিন্তু আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে স্থান, কাল ও বস্তু সবই নিরপেক্ষতা হারালো। সৃষ্টি হলো চার মাত্রিক বক্রতল, যা বস্তুর পরিমাণ নির্ধারণ করে। আর এই চার মাত্রিক বক্রতলে আলোর চলার পথও বেঁকে গেল। শতবর্ষে আপেক্ষিকতা। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যৌথ প্রয়াসে একীভূত তত্ত্বের স্বপ্ন আর কতদূর! আর কত শতাব্দী মানবজাতিকে অপেক্ষা করতে হবে! এর আগে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে তিন ব্যক্তির পর আর কতজন আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বুঝতে পেরেছে! আর্থার এডিংটনের সেই উক্তি কখন যথার্থতা হারাবে, যেখানে তিনি বলেছিলেন, পৃথিবীতে তিনটি লোক মাত্র আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব বোঝে।